ইসলাম ধর্মের রূপরেখা

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট • কলকাতা ৭০০০৭৩

অনুবাদ

মলয় চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ

সেপ্টেম্বর, ১৯৪৭

প্রকাশক

শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর

এন. গোস্বামী

নিউ নারায়ণী প্রেস

১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলকাতা ৭০০০১২

প্রচ্ছদ

উদয় চক্রবর্তী

নিবেদন

বহুদিন থেকে মনোবাসনা ছিল যে হিন্দুদের—বিশেষত পণ্ডিত সমুদয়কে 'ইসলাম' ধর্মের সঙ্গে পরিচিত করানোর জন্য একখানা গ্রন্থ রচনা করব। সংযোগবশত তার সুযোগ পেলাম ১৯২২ সালের কারাবাসের কালে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত সমাজ একে তো হিন্দী ভাষার প্রতি রুচি কমই রাখে, দ্বিতীয়ত তাদের পরিচিত ভাষায় লিখলে গ্রন্থটি ভালো প্রচার পাবে এই সব ভেবে আমি প্রথমে সংস্কৃত ভাষাতেই বইটি লেখা আরম্ভ করি। কিছুটা লেখার পর সেটা আমি আমার সহযোগী নারায়ণবাবুকে পড়ে শোনাই। তিনি রায় দিলেন যে এ ধরনের গ্রন্থ হিন্দী ভাষাতেই লেখা উচিত। তারপর থেকে 'ইসলাম ধর্মের রূপরেখার' কিছু অংশ হিন্দীতেও লেখা হয়। কারাবাস থেকে মুক্ত হবার পর অনেক মহানুভব সুহৃদ এটিকে ছাপাবার পরামর্শ দেন, কিন্তু আমি নিরুপায় ছিলাম, কারণ তখনও গ্রন্থটি পরিষ্কার করে লেখা হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া বাইরের অন্যান্য কাজের ধাক্কায় লেখাটির সংস্কারও করতে পারছিলাম না। সৌভাগ্যবশত সময় পাওয়া মাত্রই গ্রন্থটিকে সমাপ্ত করার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট হই। জানি না সংস্কৃত ভাষায় 'ইসলাম ধর্মের রূপরেখা' কবে পর্যন্ত পাঠকের হাতে গিয়ে পৌঁছাবে। তবে হিন্দী ভাষায় 'ইসলাম ধর্মের রূপরেখা' অবশেষে পাঠকের হাতে পৌঁছাচ্ছে।

হিন্দু ধর্মে যেমন অনেক সম্প্রদায়ের অবস্থান আছে এবং তাদের সিদ্ধান্তগুলির মধ্যেও যথেষ্ট প্রভেদ আছে, ইসলামেরও তেমনই অবস্থা। অতএব সেই বিড়ম্বনা এড়াবার জন্য আমি মূল 'কোরাণ'-এর শব্দকে কেবলমাত্র ভাষা পরিবর্তন করে তার সাহায্যে ইসলাম ধর্মকে ধরবার চেষ্টা করেছি। খুব কম জায়গাতেই নিজের মতামত ব্যক্ত করেছি। যেটুকু করেছি সেটুকুও বিষয়টিকে পাঠকের সামনে স্পষ্ট করার উদ্দেশ্যে করেছি।

গ্রন্থটি রচনার প্রধান উদ্দেশ্য হিন্দুদের আপন প্রতিবেশী মুসলমান ভাইদের ধর্মের সম্বন্ধে একটা ধারণা দেওয়া। যার অভাবে দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে একের অপরের সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়ে চলেছে। যদি উপরোক্ত অভিপ্রায়ের কিয়দংশও এই গ্রন্থের দ্বারা পূরণ হয়, তাহলে আমার এই পরিশ্রম সফল হয়েছে মনে করব।

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

অনুবাদ প্রসঙ্গে

অনেক বছর আগে পরাধীন ভারতবর্ষে, মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন অনুভব করেছিলেন যে ভারতের দুটি প্রধান ধর্মের অনুগামীদের মধ্যে ঐক্য থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। এবং এই ঐক্যের জন্য প্রয়োজন একে অপরের ধর্ম সংস্কৃতিকে জানা। দীর্ঘকাল দুই সম্প্রদায় পাশাপাশি কয়েক শতাব্দী বসবাস করা সত্ত্বেও বৈরীতার মনোভাব হ্রাস না হওয়ার অন্যতম কারণও এটি। রাহুলজী নিজেই এগিয়ে এসেছিলেন। এই গ্রন্থের রচনাকালে রাহুলজী বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন, পরবর্তীকালে তিনি বস্তুবাদী দর্শনের অনুগামী হন যেখানে নিরীশ্বরবাদই প্রধান। কিন্তু তা সত্ত্বেও 'ইসলাম ধর্মের রূপরেখা' নামে গ্রন্থ রচনা করে সাম্প্রদায়িক বাতাবরণের মধ্যে সমঝোতার ভাব আনার জন্য অগ্রণী হয়েছিলেন। গ্রন্থটিতে ছোট পরিসরে ইসলাম ধর্মের মূল রীতি-নীতিগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং অধিকাংশ স্থলে প্রমাণ হিসাবে পবিত্র কোরাণের বাক্যকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। পবিত্র কোরাণ বা কোরাণ শরীফ ইসলাম ধর্মের সর্বোচ্চ সংবিধান।

গ্রন্থটি অনুবাদকালে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে কারণ ধর্মীয় আলোচনাভিত্তিক গ্রন্থে সামান্য বিচ্যুতিও যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। কোরাণ শরীফের বাক্যের যথাযথ অনুবাদের জন্য, অখিল ভারত গণশিক্ষা-প্রসার সমিতি কর্তৃক মে মাসে কলকাতা থেকে প্রকাশিত কোরাণ শরীফের বঙ্গানুবাদের সাহায্য গ্রহণ করেছি যার অনুবাদক ডঃ ওসমান গণি। তাছাড়া মাননীয় রফিকউল্লাহ সম্পাদিত ও সংকলিত হাদীস শরীফ (হরফ প্রকাশনী) গ্রন্থটি থেকেও সাহায্য নিয়েছি।

গ্রন্থের কলেবর ক্ষুদ্র হলেও, বিষয়বস্তু যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এহেন গ্রন্থের অনুবাদে যাদের সাহায্য পেয়েছি তাতে প্রথমেই বলতে হয় আমার ভগ্নীপতি শিশু সাহিত্যিক ডঃ তপন চক্রবর্তীর কথা। তিনি তাঁর সংগ্রহ থেকে কোরাণ ও হাদীস শরীফ গ্রন্থ দুটি দিয়ে আমাকে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। Leviticus বা তৌরাত (ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থ) থেকে কোরবানি সম্পর্কিত একটি অধ্যায় বঙ্গানুবাদে সাহায্য করেছেন আমার ভাগিনেয়ী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি ভাষার ছাত্রী শ্রীমতী ঝুমুর সাহা। তার কাছেও ঋণ স্বীকার করা প্রয়োজন। পরিশেষে ধন্যবাদ চিরায়ত প্রকাশনীকে যারা গতানুগতিকতার বাইরে এ রকম একটি গ্রন্থ প্রকাশে অগ্রণী হয়েছেন।

মলয় চট্টোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

চতুর্থ বিন্দু [২৬-৩৩]

পঞ্চম বিন্দু [৩৪-৪৩]

ষষ্ঠ বিন্দু [৪৪-৫১]

সপ্তম বিন্দু [৫২-৬১]

অষ্টম বিন্দু [৬২-৮০]

নবম বিন্দু [৮১-৮৫]

দশম বিন্দু [৮৬-৯২]

একাদশ বিন্দু [৯৩-৯৬]

প্রথম বিন্দু

আরব এবং মহাত্মা মুহম্মদ

এশিয়া ভূখণ্ডের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে পারস্য উপসাগর, ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, 'হলব' প্রদেশ এবং ফোরাত ইত্যাদি নদী দিয়ে ঘেরা আরব দেশ। ৬০০০ মাইল দীর্ঘ এবং ২২৪০ মাইল প্রশস্ত বালুকাময় এই বিরাট দেশটিকে বহুলাংশে আমাদের দেশের মাড়োয়ার অথবা বিকানীর অঞ্চলের সঙ্গে তুলনা করা যায়। বহুদিন যাবৎ আরবের অধিবাসীরা যাযাবর পশুপালকের জীবন-যাপন কবত এবং কখনোই কোনো এক জায়গায় স্থায়ী হয়ে বসবাস করত না। তাদের পালিত পশুদের মধ্যে ছিল মেষ এবং উট। 'শাম' অর্থাৎ ফিলিস্তিনী ভাষায় মরুভূমিকে 'অরবত' বলা হয়। এই অরবত শব্দ থেকেই আরব শব্দটি এসেছে। সেখানকার উচ্চতম পর্বতের নাম সিরাত, যা ইয়েমেন প্রদেশ থেকে আরম্ভ হয়ে ফিলিস্তিন (শাম) পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এই পর্বতের উচ্চতম শৃঙ্গের উচ্চতা ৫৩৩৩ হাত। এই পার্বত্যাঞ্চলে মাঝে মধ্যে বিশেষ করে শাম অঞ্চলে কৃষিকাজের উপযুক্ত ভূমিও বর্তমান। এই পাহাড়ের স্থানে স্থানে সোনা রূপার খনিও বর্তমান।

প্রাচীন আরব

অত্যন্ত প্রাচীনকালে 'জদীস', 'আদ', 'সমূদ' ইত্যাদি জাতিগোষ্ঠী, বর্তমানে যাদের সংখ্যা নামমাত্র, আরবদেশে বাস করত। ভারত-সম্রাট হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক হজরত মুহম্মদের সময়ে 'কহতান', 'ইসমাইল' এবং ইহুদীবংশীয় লোকজনও কিছু সংখ্যায় সেখানে বাস করত। প্রাচীন আরবদেশের সভ্যতা সম্বন্ধে জার্মান পণ্ডিত 'নবেলদকী' লিখেছেন—

'যীশুখৃস্টের জন্মের এক হাজার বছর আগে আরবদেশের অগ্নিকোণে সভ্যতার বিকাশ চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। গ্রীষ্মের ঋতুতে বর্ষা হয়ে গেলে 'সেবা' এবং 'হামীর'-এর 'ইয়েমেন' দেশ শস্য শ্যামলা হয়ে উঠত। সেখানকার শিলালেখ এবং সুদৃশ্য প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও আমাদের অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবি রাখে। 'সমৃদ্ধ আরব' গ্রীক ও রোমকদের (ইতালীয়) উচ্চারিত এই শব্দটি সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই অতিশয়োক্তি ছিল না। 'সেবা'-র গৌরবগাঁথার অনেক উদাহরণ 'বাইবেল'-এ খুঁজে পাওয়া যায়। যেখানে 'সেবা'-র মহারানীর

সঙ্গে রাজা সলোমনের সাক্ষাৎকার স্মরণীয় হয়ে আছে। সেবা-র অধিবাসীরাই উত্তরে আরবের দামাস্কাস থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে আবিসিনিয়া (আফ্রিকা) পর্যন্ত লিখন শৈলীর প্রচার করেছিল।'

মাননীয় ফরেস্টার তাঁর ভূগোল বিষয়ক গ্রন্থে শামদেশের প্রতিবেশী প্রাচীন 'নাবত' রাজ্যের বিষয়ে লিখেছেন—

'মাননীয় ইউটিঙের প্রচেষ্টাতেই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের সামগ্রী থেকে চিরলুপ্ত সমৃদ্ধ জাতির পরিচয় আমরা পেয়েছি। প্রারম্ভে তাদের দ্বারাই শিক্ষিত 'নাবত' জাতিও এদের সদৃশই ছিল। এই 'নাবত' জাতির কীর্তি আরবের মরুভূমিকে অতিক্রম করে হিজাজ এবং নজ্‌দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ব্যবসাবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থোপার্জনে নিপুণ এই জাতি ইসমাইলী জাতি গোষ্ঠীর লোকের মতো যুদ্ধভয় থেকেও নির্ভয় ছিল। এরা শাম অর্থাৎ ফিলিস্তিন আক্রমণ করে জয় করেছিল এবং বহুবার আরব সাগরে মিশরীয় বাণিজ্যপোতের ওপরেও হামলা চালিয়ে সেগুলিকে লুণ্ঠন করেছিল। তাদের সেই সমস্ত দুঃসাহসিক কাজের ফলে ইউনানী (গ্রীক) রাজারাও তাদের শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র রোমের সম্মিলিত শক্তি ছাড়া আর কেউ তাদের পরাজিত করতে সক্ষম হয়নি। অস্ত্রাবুর সময়ে তারা একপ্রকার বাধ্য হয়ে রোমকদের সীমিত অধীনতা স্বীকার করে।'

মাননীয় থ্যাচার তাঁর 'অ্যাংলো বিশ্বকোষ' গ্রন্থে লিখেছেন—

'যীশুখৃস্টেরও কয়েক শতাব্দী পূর্বে আরবের দক্ষিণাঞ্চলে আরও একটি উচ্চতম সভ্যতা বিরাজমান ছিল। এখনো সেখানকার নগর প্রাকার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়নি এবং যার বর্ণনা আমরা অনেক ভ্রমণকারীর ভ্রমণ বৃত্তান্তের মধ্যে পেয়েছি। ইয়েমেন এবং হজ্রমৌত অঞ্চলে এই ধরনের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান।'

কদজার্নী তাঁর 'নগরের ধ্বংসাবশেষ' গ্রন্থে সেনোয়ার সমীপবর্তী দুর্গটিকে বিশ্বের সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম বলে বর্ণনা করেছেন—

'প্রাচীন সেবার রাজধানী আরবনগরীর ধ্বংসকে অর্নো, হলওয়ে, গ্লাজ্রী ইত্যাদি বিদ্বজ্জনেরা স্বচক্ষে দেখেছেন। সেখান থেকে উদ্ধারীকৃত বস্তুসামগ্রীর বিষয়ে দুটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে গ্লাজ্রী প্রমাণ করেছেন যে সেই সভ্যতার সময়কাল ছিল খৃস্টপূর্ব পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ শতাব্দী।'

মুহম্মদের সময়ের আরব

প্রাচীন কালের আরব জাতি অত্যন্ত সুসভ্য এবং শিল্পকলায় উন্নত ছিল একথা যথেষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সময়ান্তরে তাদের বংশধরেরা অবিদ্যার ঘোরতর অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে এবং সভ্যতার সমস্ত নিদর্শন, শিল্পকলা বিস্মরিত হয়ে, উট, মেষপাল চরিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হয়। একজন্য তারা সর্বদাই এক হরিৎ চারণভূমি থেকে আরেকটি হরিৎ চারণভূমির সন্ধানে

জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়াত। তাদের এই ভবঘুরে জীবনে বৃহত্তর জাতির কথা মনে না রেখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েই জীবন-যাপন করত। সেই সময় গোসাপ, গিরগিটি, কানখাজুরা প্রভৃতি মরুভূমির নিম্নপ্রজাতির প্রাণীও তাদের ভক্ষ্য ছিল। নরবলি, ব্যভিচার, মদ্যপান, জুয়াখেলা ইত্যাদিতে তারা যারপরনাই আসক্ত ছিল। প্রাক্ ইসলাম যুগে আরবে পিতার মৃত্যুর পর তার অগুণতি বিধবা স্ত্রীদের সম্পত্তির মতো উত্তরাধিকার সূত্রে পুত্রদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হতো এবং পুত্ররাও তাদের নিজেদের স্ত্রীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নিত। রাজপুত্র অম্রুল্কৈস রচিত কাব্য, যেখানে কবি তার পিতৃস্বসার কন্যার প্রতি দুরভিসন্ধিমূলক ব্যভিচারের কাহিনী বর্ণনা করেছে, সেরকম নিকৃষ্ট কাব্যগ্রন্থকেও তৎকালীন লোকেরা মহা প্রসন্নতার সঙ্গে কাবার মতো পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ মন্দিরে স্থান দিয়েছিল। প্রাচীন সাম্রাজ্যের পতনের পর থেকে স্থানীয় সামন্ত অথবা পরিবারতন্ত্রের যুগ চলছিল। এই সামন্ত প্রভুরা কিংবা পরিবারের প্রতিভূরা মহানন্দে পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধবিগ্রহ চালিয়ে যেত। যে কোনো একজনের নিহত হওয়ার অর্থই ছিল নিহত এবং হত্যাকারী এই দুই পরিবারের মধ্যে চিরকালীন শত্রুতার আরম্ভ। জন্মের পর মাতৃদুগ্ধের সঙ্গেই শিশুকে তার শত্রু পরিবার সম্বন্ধে ঘৃণার আগুন পান করানো হতো, যাতে তার হৃদয়ে প্রতিশোধের বাসনা সদা জাগ্রত থাকে। যুদ্ধে বন্দী হওয়া স্ত্রী, পুরুষ, শিশু, বৃদ্ধদের শিরোশ্ছেদ করা অতি সাধারণ বিষয় ছিল। নিদ্রিত মানুষকে অতর্কিতে আক্রমণ করে তাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন এবং হত্যায় যারা পারদর্শী ছিল, তাদের 'ফাতক' অথবা 'ফত্তাক' ইত্যাদি শব্দে বন্দিত করা হতো। জ্বলন্ত আগুনে মানুষকে ফেলে দেওয়াটাকে তাদের কাছে কোনো অন্যায় কাজ বলে মনে হতো না। হিন্দপুত্র অম্রু তার এক ভাই নিহত হওয়ায়, তার পরিবর্তে একশত জনকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করে। একদিন সে তার প্রতিপক্ষ তমীম বংশীয়দের ওপরে আক্রমণ করে। আগাম খবর পেয়ে বসতির লোকজন পালিয়ে গিয়েছিল, শুধুমাত্র হমরা নামে এক বৃদ্ধা সেখানে থেকে যায়। প্রতিশোধ স্পৃহায় অম্রু সেই বৃদ্ধাকেই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে। সেই সময় দুর্ভাগ্যের শিকার হয়ে 'অমারা' নামের এক ক্ষুধার্ত পথিক দূর থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখে সেখানে এসে উপস্থিত হয়। লুণ্ঠনকারীরা তার আসার হেতু জানতে চাইলে, সে বলে, সে বিগত কয়েকদিন ধরে অভুক্ত রয়েছে, কিছু খাদ্যের আশায় সে এখানে এসেছে। শুনে অম্রু তার সঙ্গীদের আদেশ দেয় যে একেও আগুনে নিক্ষেপ করো।

তাছাড়া, কোমল শিশুদের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে তীরন্দাজী অভ্যাস করা, অসহ্য যন্ত্রণা দেবার জন্য শরীরের এক একটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একটু একটু করে কাটা, শত্রুর মৃতদেহ থেকে নাক, কান কেটে নেওয়া, চোখ উপড়ে নেওয়া, এমনকি তার হৃদপিণ্ড ভক্ষণ করা তখনকার দিনের অনেক ক্রূর ও নিষ্ঠুর আচরণের অন্যতম

ছিল। (উহদের যুদ্ধে হিন্দা নামের এক স্ত্রীলোক মহাত্মা মুহম্মদের অন্যতম সহায়ক হমুজা নিহত হবার পর তার হৃদপিণ্ড কেটে ভক্ষণ করেছিল।)

মুহম্মদের জন্ম

এই রকম এক তমসাচ্ছন্ন কালে আরব দেশের প্রধান নগর মক্কাতে (মক্কা) আব্দুল মোতল্লেবের পুত্র আবদুল্লাহ্‌র স্ত্রী আমিনার গর্ভে স্বনামধন্য মহাত্মা মুহম্মদ ৬১৭ বিক্রম সম্বতে জন্মগ্রহণ করেন। (খৃস্টীয় ৫৭০ অব্দের ২০শে আগস্ট, মতান্তরে ২৯শে আগস্ট, মতান্তরে ৫৭১ খৃস্টাব্দে ২০ অথবা ২১শে এপ্রিল) মহাত্মা মুহম্মদের বংশ মক্কায় 'হাশিম'বংশ নামে প্রসিদ্ধ ছিল। মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেই মুহম্মদের পিতৃবিয়োগ হয়। জন্মের পর থেকে পিতৃহীন বালক মাতা ও পিতামহের স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত হতে থাকেন। তৎকালীন মক্কা নগরের এক প্রচলিত প্রথা ছিল যাযাবর বেদুইনদের কাছে প্রতিপালনের জন্য শিশুদের দেওয়া। সাদ বংশের হালিমা নামে এক বেদুইন স্ত্রীলোক মক্কায় সেই সময় এসেছিল। প্রতিপালনের জন্য কোনো শিশু না পাওয়ায় সে স্বাভাবিকভাবেই মনঃক্ষুণ্ন ছিল। অতঃপর তাকে যখন বলা হয় যে তুমি দরিদ্র আমিনার পুত্রকে প্রতিপালন করো, তখন প্রথমে সে সম্মত হয়নি, কারণ প্রতিপালনের বিনিময়ে অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা বিশেষ ছিল না। কিন্তু 'একেবারে শূন্যহাতে ফেরার চেয়ে যা পাওয়া যায় তাই ভালো' এরকম ভেবে হালিমা শিশু মুহম্মদকে নিয়ে তার ডেরায় চলে যায়। এইভাব শিশু মুহম্মদ চার বছর বয়সকাল পর্যন্ত বেদুইনগৃহে পালিত হন। তারপর আবার তিনি তাঁর স্নেহময়ী জননীর কোলে ফিরে আসেন। কিছুদিন পর পুণ্যবতী আমিনা তাঁর আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মদীনায় পিতৃগৃহে যাত্রা করেন, সঙ্গে শিশুপুত্র মুহম্মদও ছিলেন। মদীনা থেকে ফেরার পথে আব্বা নামের এক জায়গায় বালক মুহম্মদকে অমৃততুল্য মাতৃকরস্পর্শ থেকে চিরবঞ্চিত করে দেবী আমিনা স্বর্গারোহণ করেন। পুত্র এবং পুত্রবধূর বিয়োগ ব্যথায় কাতর পিতামহ আব্দুল মোতল্লেব হৃদয়ের সমস্ত বাৎসল্যরস সিঞ্চিত করে পৌত্রের লালন পালনের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেন। কিন্তু ভাগ্যের বোধ হয় এমতবস্থাতেও সম্মতি ছিল না। বালক মুহম্মদের আট বছর বয়সে তাঁর পিতামহেরও দেহাবসান হয়। মৃত্যুকালে পিতামহ আব্দুল মোতল্লেব তাঁর আরেক পুত্র আবুতালিবকে ডেকে বালক মুহম্মদকে পুত্রবৎ লালন পালনের জন্য আদেশ দিয়ে যান।

অতঃপর মহাত্মা মুহম্মদ পিতৃব্য আবুতালিবের স্নেহময় অভিভাবকত্বে বড় হয়ে উঠতে থাকেন। বালক বয়সে তিনি কখনো মেষপালক চরাতে নিয়ে যেতেন, কখনো বা সমবয়স্ক সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধুলাতে মেতে থাকতেন। বালক মুহম্মদের যখন বারো বছর বয়স তখন তাঁর খুল্লতাত ব্যবসায়ের কাজে বাইরে যাচ্ছিলেন,

তখন বালক মুহম্মদ তাঁকে সঙ্গে নেবার জন্য অনুনয় বিনয় করতে থাকেন। পিতৃব্য আবুতালিব পথের দুর্গমতা এবং কষ্টের কথা ভেবেই বালককে সঙ্গে নিতে প্রথমে রাজী হননি। আবুতালিব যখন ঘর থেকে বের হওয়ার উপক্রম করছিলেন, সেই সময় ভ্রাতুষ্পুত্র মুহম্মদ তাঁর উটের লাগাম ধরে ক্রন্দন শুরু করেন, 'আমার না আছে বাবা, না আছে মা, আমাকে একা রেখে আপনিও চলে যাচ্ছেন, আমাকেও আপনার সঙ্গে নিন।' বালক মুহম্মদের এ ধরনের কথাবার্তায় খুল্লতাত আবুতালিবের হৃদয় এতদূর দ্রবীভূত হয় যে তিনি বালকের কাতর আবেদনকে আর কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারলেন না। তিনি শাম (ফিলিস্তীন) দেশের দিকে বাণিজ্য করতে যাচ্ছিলেন, বালক মুহম্মদও তাঁর সঙ্গী হলেন। এই যাত্রাকালেই বালক মুহম্মদ খৃস্টের তপস্যাধন্য 'বহেরা' (জেরুসালেমের বেথেলহেম) প্রথমবার দর্শন করেন।

বিবাহ

জনশ্রুতি আছে যে অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন মহাত্মা মুহম্মদ অক্ষরজ্ঞান শূন্য ছিলেন। ব্যবহারিক বুদ্ধিমত্তা, সততা ইত্যাদি বহুবিধ সদ্‌গুণের জন্য কোরেশ বংশীয় এক বিত্তশালিনী মহিলা খাদিজা মহাত্মা মুহম্মদকে তাঁর ব্যবসায়ের গোমস্তার কাজে নিযুক্ত করেন। মহাত্মা মুহম্মদের বয়স যখন পঁচিশ বছর, তখন তিনি বিবি খাদিজার ব্যবসায়ের কাজে আবার ফিলিস্তীনে যান। মহাত্মা তাঁর ওপরে ন্যস্ত ব্যবসায়িক দায়িত্ব অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন এবং প্রতি ক্ষেত্রে সততার অপূর্ব নজির সৃষ্টি করেন। এর কিছুদিন পর বিবি খাদিজা মহাত্মা মুহম্মদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব রাখেন। বিবি খাদিজার বয়স তখন চল্লিশ বছর, এবং তাঁর দুই স্বামীরই মৃত্যু হওয়ায় তিনি তখন বৈধব্য জীবন-যাপন করছিলেন। মহাত্মা মুহম্মদ বিবি খাদিজার মধ্যে অনেক সদ্‌গুণের পরিচয় পেয়েছিলেন, এবং সেই কারণেই তিনি তাঁর প্রার্থনা স্বীকার করেন।

তৎকালীন মূর্তি সমূহ

হুব্ল, লাত্‌, মনাত্‌, উজ্জ, প্রভৃতি নামের অনেক দেবদেবীর প্রতিমা সে সময় আরবীয়দের কোনো না কোনো কবিলার (গোষ্ঠী) ইষ্টদেব বা দেবী ছিল। অনেক প্রাচীন কালে এই অঞ্চলে মূর্তিপূজার প্রচলন ছিল না। অমরু নামের কাবার প্রধান এক পুরোহিত শাম (ফিলিস্তীন) দেশে গিয়ে শুনেছিল যে এই সমস্ত দেবদেবীর আরাধনায় বিপদে আপদে রক্ষা পাওয়া ছাড়াও যুদ্ধের কালে শত্রুর ওপরে বিজয় লাভ করা যায়। অমরু নামের সেই পুরোহিতই শাম অঞ্চল থেকে কয়েকটি মূর্তি এনে কাবার মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে। দেখতে দেখতে এদের

প্রচার এত প্রসার লাভ করে যে সারা দেশেই মূর্তিপূজায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। শুধুমাত্র কাবা মন্দিরেই তিনশত ষাটটি বিভিন্ন মূর্তি ছিল। এই মূর্তিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল হুব্ল, যার অধিষ্ঠান ছিল মন্দিরের ছাদে এবং সেটি ছিল কোরেশদের ইষ্টদেব। অলল্-হুব্ল (জয়-হুব্ল) ছিল তাদের জাতীয় ঘোষণা। লোকে বিশ্বাস করত যে এই সমস্ত মূর্তিপূজার মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্নিকটে পৌঁছানো যায় এবং সেজন্যই তারা এর পূজা করত। আরবী ভাষায় ইলাহ শব্দটি দেবতা এবং তার মূর্তির প্রতি প্রযুক্ত হতো। কিন্তু আল্লাহ্ শব্দ ইসলামের কালের আগে থেকেই ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়ে আসছিল।

শ্রীমতী খাদিজা এবং তাঁর ভাই নৌফল মূর্তিপূজার বিরোধী ইহুদী ধর্মের অনুগামী ছিলেন। মহাত্মা মুহম্মদ বিভিন্ন সময় বাণিজ্যের প্রয়োজনে দেশ বিদেশে যাত্রা করতেন এবং তখন অনেক সাধু মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলেন যারা ছিলেন একেশ্বরবাদী, মূর্তিপূজার বিরোধী, তাছাড়া গৃহে স্ত্রী খাদিজাও ব্যক্তিগত ভাবে ওই প্রথার বিরোধী ছিলেন, অন্যদিকে মূর্তিপূজকেরা অত্যন্ত নৃশংস ছিলেন। এই সমস্ত পরস্পর বিরোধী অভিজ্ঞতা মুহম্মদকে মূর্তিপূজা সম্পর্কে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। তিনি খৃস্টান সন্ন্যাসীদের মতো অনেকবার হীরা পর্বতের গুহাতে একান্ত সাধনা এবং ঈশ্বর প্রণিধানের জন্য গিয়েছেন। 'ইক্রা-বি-ইস্মি রব্বিক' (পড়ো, আপন প্রভুর নামে) কোরাণের এই প্রথম বাক্যটি এখানেই স্বর্গীয় দূত জিব্রাইল ঈশ্বরের আদেশে মহাত্মা মুহম্মদের হৃদয়ে অবতীর্ণ করেন। সেই সময় জিব্রাইলের ভয়ঙ্কর শরীর দেখে মহাত্মা মুহম্মদ কিছুক্ষণের জন্য মূর্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। পরে তিনি যখন সমস্ত ঘটনা তাঁর স্ত্রী খাদিজা এবং তাঁর ভাই নৌফলকে শোনালেন, তখন তাঁরা বলল—'আপনি অবশ্যই দেবদূতের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, এবং যিনি ঐশী বাক্য নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলেন। মহাত্মা মুহম্মদের বয়স তখন চল্লিশ। তখন থেকেই মহাত্মার পয়গম্বর বা রসুলের জীবনের শুভারম্ভ হয়।

ইসলামের প্রচার এবং তার বিরোধিতা

ঈশ্বরের দিব্য আদেশ প্রাপ্ত হয়ে মহাত্মা মুহম্মদ মক্কার দাম্ভিক মূর্তি পূজারীদের কোরাণের উপদেশ শোনাতে আরম্ভ করেন। মেলার বিশেষ দিনে ('ইহ্ রাম'-এর মাসে) দূরদূরান্ত থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের সমাবেশে তিনি ছল কপটতাযুক্ত লোকাচার এবং বহু দেবতার আরাধনার মতবাদকে খণ্ডন করতেন এবং একেশ্বরের (আল্লাহ্) উপাসনা এবং বিশুদ্ধ সরল ধর্মাচরণের উপদেশ দিতেন। মক্কার কুরেশ বংশীয়রা তাদের ইষ্টদেব, আচার-আচরণ এবং উপার্জনের উপায়কে এভাবে নিন্দা করতে দেখে, তার ওপরে প্রবল কুঠারাঘাত করতে দেখেও হাশিম পরিবারের চিরকালীন শত্রুতার মুখোমুখী হবার আশংকায় মহাত্মা মুহম্মদের প্রাণনাশের সাহস

করেনি। কিন্তু এই নবীন ধর্মে দিক্ষীত দাসদাসীদের তারা উত্তপ্ত বালুকারাশির মধ্যে শুয়ে থাকতে বাধ্য করত। চাবুক মারত এবং আরও নানা ধরনের অবর্ণনীয় যন্ত্রণা দিত। কিন্তু এত অত্যাচার সত্ত্বেও এই নতুন ধর্মের অনুসরণকারীরা তাদের ধর্মপথ ত্যাগ করেনি এবং অনেক প্রলোভন দেখানো হলেও তাদের ধর্ম বিশ্বাস বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি। দিনের পর দিন সেই অসহনীয় এবং অমানুষিক অত্যাচার তাঁর অনুগামীদের ওপরে চলতে দেখে অবশেষে মহাত্মা মুহম্মদ তাঁর মত ও পথ অনুসরণ কারীদের আফ্রিকা ভূখণ্ডের হবস্ (আবিসিনিয়া) নামক রাজ্যে চলে যেতে বলেন। হবস্ (হাবসীদের ভূখণ্ড) রাজ্যের রাজা ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ এবং প্রজাপালক। যেমন যেমন মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কুরেশীয়দের বিদ্বেষ বহ্নিও সেই অনুপাতে বেড়ে চলছিল। কিন্তু তারা আবু-তালিবের জীবদ্দশায় খোলাখুলি মহাত্মার ওপরে হামলা করার সাহস করেনি। আবুতালিবের মৃত্যুর পর তারা তাদের সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ পরিত্যাগ করে সর্বোত-ভাবে মহাত্মা মুহম্মদের বিরোধিতায় নেমে পড়ে।

মদীনা গমন

তখন মহাত্মা মুহম্মদের বয়স তিপান্ন বছর। তাঁর পুণ্যবতী স্ত্রী মহীয়সী খাদিজার দেহান্ত হয়েছিল। একদিন কুরেশীয়রা তাঁকে হত্যা করার অভিপ্রায়ে তাঁর বাস-স্থানকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলে। কিন্তু পয়গম্বর মুহম্মদ কুরেশীয়দের হীন ষড়যন্ত্রের কথা আগে থাকতেই জানতে পেরেছিলেন এবং তার ফলে তিনি আগেই মক্কা ত্যাগ করে 'য়স্রিব' (মদীনা) নগরে চলে গিয়েছিলেন। মদীনার শিষ্যবর্গ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের পয়গম্বরের সেবা করার বাসনা মহাত্মাকে জানিয়েছিল। মহাত্মার মদীনা আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তারা তাঁর আহার, বাসস্থান ইত্যাদির ব্যবস্থা করে। যখন থেকে নবী মুহম্মদ তাঁর নিবাসস্থান হিসাবে য়স্রিব নগরকে বেছে নিয়েছিলেন, তখন থেকে নগরের নাম হয়ে যায় মদীনতুন্নবী অথবা নবীর নগর। পরবর্তী কালে সেই নগর মদীনা নামে পরিচিত হয়। পবিত্র কোরাণ তিরিশ খণ্ডে সম্পূর্ণ এবং সেটি আবার ১১৪টি সূরাতে (অধ্যায়ে) বিভক্ত। নিবাসক্রমানুসারে প্রত্যেক সূরা 'মক্কী' অথবা 'মদনী' নামে পরিচিত। অর্থাৎ যে সমস্ত সূরা মক্কাতে অবতীর্ণ হয়েছিল তাকে বলা হয় মক্কী এবং মদীনাতে অবতীর্ণ সূরার নাম মদনী। (পবিত্র কোরাণের প্রত্যেক অধ্যায়ে অনেক রুকু এবং প্রত্যেক রুকুর মধ্যে অনেক আয়াত থাকে।)

মৃত্যু

মদীনা নগরেও নবী মুহম্মদ বেশীদিন শান্তিতে বিশ্রাম নিতে পারেননি। কুরেশীয়রা সেখানেও তাঁকে উত্যক্ত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে স্বীয়

অনুগামীদের রক্ষা করার আর কোনো উপায় না দেখে, তাঁকে মদীনাবাসী ইহুদী-দের সঙ্গে অনেক যুদ্ধ করতে হয়। এই সমস্ত ইহুদীরা ছিল কুরেশীদের হীন চক্রান্তের অন্যতম সহায়ক। অবশেষে এই যুদ্ধের পরিসর বিস্তৃত হতে থাকে এবং যার পরিসমাপ্তি মক্কা বিজয়ের মধ্য দিয়ে। মক্কা বিজয়ের পর কাবার মন্দিরকে মূর্তিশূন্য করা হয়। জন্মস্থানকে জয় করার পরও মদীনাবাসীদের ভালোবাসায় আবদ্ধ হয়ে মহাত্মা মুহম্মদ তাঁর অমূল্য জীবনের শেষ দিনটি পর্যন্ত মদীনাতেই অতিবাহিত করেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই সমস্ত আরবভূখণ্ড একরাষ্ট্র সূত্রে গ্রথিত হয়ে ইসলাম ধর্ম স্বীকার করে। তেষট্টি বছর বয়সে মহাত্মা মুহম্মদ তাঁর জীবনের মহান্ উদ্দেশ্যকে সমাপ্ত করে সমগ্র শিষ্যমণ্ডলীকে অসীম দুঃখসাগরে ভাসিয়ে প্রাণ ত্যাগ করেন। পবিত্র কোরাণের ভাবকে বুঝতে হলে প্রতি পদে পদে তৎকালীন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতাকে স্মরণে রাখতে হবে। সেই জন্য মহাত্মা মুহম্মদের জীবনকাহিনী এবং প্রাচীন আরবের ইতিহাস, সংক্ষেপে হলেও জানা প্রয়োজন। সেই কারণেই ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত আলোচনায় প্রবেশ করার পূর্বে সেই বিষয়ের আলোচনা কিছু পরিমাণে এই পরিসরে করে নিলাম। মহাত্মা মুহম্মদের জীবনের চল্লিশতম বছরে 'ইক্রা বি ইস্মি রব্বিক' থেকে আরম্ভ করে মৃত্যুর সতেরো দিন আগে পর্যন্ত (ভিন্ন মতে বারো দিন) 'রব্বিকল অক্রম' (প্রভু তুমি অত্যন্ত মহান্) এই বাক্যের অবতীর্ণ হওয়া পর্যন্ত, যা কিছু দিব্য উপদেশ তিনি প্রচার করেছেন তার সমগ্র সংগ্রহের নামই 'কোরাণ শরীফ' বা পবিত্র কোরাণ এবং এই পবিত্র কোরাণ ইসলাম ধর্মের স্বতঃ প্রমাণিত গ্রন্থ।

দ্বিতীয় বিন্দু

কোরাণের প্রয়োজনীয়তা, বর্ণনশৈলী

'কদাচিৎ তোমাদের জ্ঞান হয়, সেইজন্যই আমি তাঁর (মুহম্মদের) ওপরে আরবী কোরাণ অবতীর্ণ করেছি।' (১২ : ১ : ২)

'মঙ্গল সন্দেশবহ, ভীতিদায়ক এই গ্রন্থ—আরবী কোরাণ পরম কৃপাময় আল্লাহ্র কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে। এর মধ্যে সেই প্রভুর লক্ষণ বর্ণিত আছে, যার দ্বারা সমস্ত মনুষ্য সম্প্রদায় তাঁকে জানতে পারে।' (৪১ : ১ : ২-৪)

'হে মুহম্মদ এভাবেই আমি আরবী কোরাণ তোমার হৃদয়স্থ করেছি। তুমি একে সমস্ত জনপদের জননী মক্কা এবং তার চতুষ্পার্শকে একত্রিত হওয়ার দিন (কেয়ামত) সম্বন্ধে সতর্ক করতে পারো। সেদিন একদল জন্নতে (স্বর্গে) প্রবেশ করবে আরেকদল জাহান্নমে (নরকে)।' (৪২ : ১ : ৭)

'হে মুহম্মদ আমি এভাবেই সেই আরবী আদেশনামা (কোরাণ) অবতীর্ণ করেছি। যা কিছু তোমার মধ্যে সেই জ্ঞানের মধ্য থেকে এসেছে তাকে পরিত্যাগ করে যদি তুমি অন্য কিছুর অনুসরণ করো তাহলে ঈশ্বরের (আল্লাহ্) পক্ষ থেকে তোমার কেউ সহায়ক অথবা রক্ষক নেই।' (১৩ : ১৫ : ৬)

কোরাণ শরীফ থেকে উপরোক্ত উদ্ধৃত বাক্যের মধ্য দিয়ে কোরাণের নামকরণ, তার ভাষা এবং প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করা হলো। কোরাণ কি? ঈশ্বর প্রদত্ত এক আরবী গ্রন্থ। এই গ্রন্থ অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? এই গ্রন্থ পথভ্রষ্টজনকে ভয় দেখাবে এবং শ্রদ্ধালুদের তার পুণ্য কর্মের মঙ্গলময় পরিণামের সন্দেশ দেবে, যাতে সকলেই সর্বদা সৎপথে থাকতে উদ্বুদ্ধ হয়। মহানুভব মুহম্মদের সময়ে আরব দেশ কতদূর পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হয়েছিল, তখনকার সামাজিক জীবন কতদূর কলুষিত এবং ব্যভিচারগ্রস্ত হয়েছিল, অজ্ঞানীরা তাদের অজ্ঞানতার বিষয়ে কতদূর পর্যন্ত সীমা লঙ্ঘন করেছিল ইত্যাদি প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে কিছু আলোচনা গ্রন্থের প্রথম বিন্দুতে করেছি, আর অতিরিক্ত কিছুর বর্ণনা আগামী বিন্দুতে (অধ্যায়ে) করা হবে।

সেই চরমতম অজ্ঞানতায় নিমগ্ন সদাচার জ্ঞানহীন ক্রূর প্রকৃতির আরব অধিবাসীদের সঠিক এবং সত্য পথে আনার একটিই পথ ছিল, তাদের পাপ কর্মের অন্তিম পরিণাম সম্বন্ধে অবহিত করে সৎকর্মের দিকে প্রেরিত করা।

প্রলোভন বহু সৎ ব্যক্তিকেও পথভ্রষ্ট করে ফেলতে সক্ষম হয়। সর্বপ্রিয় হবার আকাঙ্ক্ষা বহু সময় অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশিত হতে দেয় না। সেজন্যই উপরোক্ত উদাহরণে একথাই বলা হয়েছে যে অন্যলোকের অনুসরণকারী কখনও

ঈশ্বরের সহায়তা এবং রক্ষণ পাবার পাত্র হতে পারে না। বস্তুতপক্ষে এই পৃথিবীতে সমালোচক এবং সংস্কারের কাজ সত্যিই কঠিন। নানা ধরনের ছল কপটতায় ভরা এই পৃথিবীতে যদি অন্যায় কর্মকে নির্ভয়ে সমালোচনা করা যায়, তাহলে বিশ্বের বিশাল এই জনসমুদ্র তার সীমাহীন অধিকার এবং চিরস্থাপিত নীতির তরঙ্গায়িত গতিপথ রুদ্ধ দেখে, নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে তার প্রতিকার করতে উদ্বুদ্ধ হয়। সুবৃহৎ তরঙ্গের কথা বাদ দিলেও, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্‌বুদ্‌ও তার শক্তি বা সীমার বিচার না করে অন্যায়ের মাথায় পদাঘাত করতে উদ্যোগী হয়। কিন্তু নিশ্চল-নীতি সত্যমনস্ক এবং সংস্কারক—

'নিন্দন্তু নীতিনিপুণা যদি বা স্তুবন্তু,
লক্ষ্মী সমাবিশতু গচ্ছতু বা যথেষ্টম্।
অদ্যৈব মরণমস্তু যুগান্তরে বা,
ন্যায়াপথঃ প্রবিচলন্তি পদং ন ধীরাঃ' ॥ ১ ॥

ভর্তৃহরির উপরোক্ত বাক্যানুসারে নিজের সর্বস্ব বিসর্জন দেওয়ার জন্য সেই প্রলয়-কোলাহলপূর্ণ, সংক্রুদ্ধ, জনসমুদ্রের কিছুমাত্র তোয়াক্কা না করে সুমেরু পর্বতের মতো আপন জায়গায় দৃঢ়ভাবে অবস্থিত থাকে, কিন্তু তার সদুপদেশ অরণ্যেরোদন সদৃশ মনে হয় কিংবা গুরুগম্ভীর ভেরী-নিনাদের সামনে ক্ষীণ বীণাধ্বনি। সহায়কদল কিংবা সংরক্ষকদের কোনো সাহায্য নেই; অথচ ভীষণ বিরোধীদের সম্মুখীন হতে হয়, এক নৈরাশ্যপূর্ণ অন্ধকারের মধ্যে, যখন তার কাছে মুহূর্তের জন্যও আশারূপী নক্ষত্রের সামান্যতম মিটমিট করা আলোও অদৃশ্য থেকে যায়। সংস্কারক হজরত মুহম্মদের জীবনও উপরোক্ত ঘটনায় পূর্ণ।

উপরের বাক্যে কোরাণের আরবীতে অবতীর্ণ হওয়ারও ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। মক্কা এবং তার চারদিকে কোরাণ তখনই উপযোগী হতে পারে যখন তা সেখানকার স্থানীয় ভাষায় লিখিত হয়। অন্য আরেক জায়গায় বলা হয়েছে—

'যদি আমি এই কোরাণ আরবী ভিন্ন অন্য ভাষায় অবতীর্ণ করতাম, তাহলে কিছু লোক অবশ্যই বলত—এর তাৎপর্য যথাযথ ব্যাখ্যা করা হয়নি কেন? কি আশ্চর্য, আরবের মানুষের জন্য রসুল আরবীয় কিন্তু গ্রন্থের ভাষা আরবী নয়। বিশ্বাসীদের কাছে এটি পথপ্রদর্শক এবং স্বাস্থ্যপ্রদ।' (৪১ : ৫ : ১২)

অনুপ্রাসবদ্ধ বর্ণন

যুদ্ধপ্রিয় আরবের অধিবাসীরা সে আমলে যথেষ্ট কাব্যপ্রিয়ও ছিল। সেখানে প্রচুর কবিদের আবির্ভাব ঘটেছিল, যাদের কাব্য বা কবিতা সমরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করার জন্য ইন্ধনের কাজ করত। এ বিষয়ে জিজ্ঞাসু এবং অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা শ্রদ্ধেয় মহেশপ্রসাদ সাধু বিরচিত প্রসিদ্ধ হিন্দী গ্রন্থ 'আরবী কাব্য' পড়ে দেখতে

পারেন। সুন্দর ভাষা শেখার জন্য এবং সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য তখনকার দিনে আরবের সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে বিশেষত মক্কা নগরের তিন থেকে ছয় বছর বয়সী শিশুদের যাযাবর বেদুইনদের শিবিরে পাঠানো হতো। শিশুরা একটা নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত সেখানেই লালিত পালিত হতো। স্বয়ং মহামান্য মুহম্মদও তাঁর শৈশব এরকম একটি শিবিরেই কাটিয়েছিলেন। যার ফলে তাঁর ভাষাও অত্যন্ত পরিমার্জিত এবং সুন্দর হয়েছিল। কোরাণের 'অথ' থেকে 'ইতি' পর্যন্ত অনুপ্রাসবদ্ধভাবে লেখা হয়েছে। যেমন—

কুল্ হুবল্লাহু অহদ্। অল্লাহুস্‌সমদ্।

লম্ য়লিদ ব লম্ য়ুলদ্। ব লম্ য়কুন্ কুফুবন অহদ্।

(বলো, ঈশ্বর এক এবং সমস্ত শক্তির আধার। তিনি না উৎপন্ন করেন, না উৎপন্ন হন, না কেউ তাঁর সমকক্ষ।) (১১২)

লৌহমহফুজ কোরাণ

কোরাণ সম্বন্ধে তার অনুগামীদের বিশ্বাস এবং যা কোরাণেও বর্ণিত আছে— 'সত্যই পবিত্র কোরাণ এক অদৃষ্ট গ্রন্থ। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শুদ্ধ-পবিত্র না হচ্ছ ততক্ষণ পর্যন্ত একে স্পর্শ করো না। এই গ্রন্থ বিশ্বজগতের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।' (৫৬ : ৩ : ৩-৫) অদৃষ্ট গ্রন্থ অর্থে এখানে বলার অভিপ্রায় এটাই যে এটি স্বর্গীয় পেটিকাতে সুরক্ষিত ছিল যাকে ইসলামী পরিভাষাতে 'লৌহমহফুজ' বলা হয়। সৃষ্টিকর্তা অনাদিকাল থেকে তার মধ্যে ত্রিকালবৃত্তি লিখে রেখেছেন, যেমন স্থানান্তরে বলা হয়েছে—

'আমি আরবী কোরাণ সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমাদের জ্ঞান হয়। নিঃসন্দেহে এটি উত্তম জ্ঞানভাণ্ডার, আমাদের জন্য সুরক্ষিত (লৌহমহফুজ) ছিল।'

(৫৩ : ১ : ৩-৪)

ঈশ্বর কোরাণে বর্ণিত জ্ঞানকে জগতের হিতের জন্য তাঁর প্রেরিত পুরুষ (রসুল) মুহম্মদের হৃদয়ে প্রকাশিত করেন। এটিই সমস্ত কোরাণের ভাবার্থ। আপন ধর্ম শিক্ষাপ্রদানকারী গ্রন্থের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা রাখা মানুষের স্বাভাবিক ধর্ম। সেই কারণে কোরাণের মাহাত্ম্য বিষয়ে অনেক কাহিনী জনমানসে প্রচলিত আছে। যদিও সে সমস্ত বিষয়ের ভিত্তি মানুষের স্বাভাবিক শ্রদ্ধা। প্রতিটি মাহাত্ম্য কাহিনীর উৎস কোরাণের মধ্যে অনুসন্ধানের চেষ্টা করা অর্থহীন। তবে মাহাত্ম্য কাহিনীর কিছুমাত্র বাক্যও কোরাণে বর্ণিত নেই, এমন কথাও বলা চলে না। এক জায়গায় বলা হয়েছে—

'যদি আমি এই কোরাণকে কোনো পর্বত শিখর অথবা পর্বতের মতো কোনো কঠোর হৃদয়ে অবতীর্ণ করতাম, তাহলে তোমরা অবশ্যই তাকে ঈশ্বরের ভয়ে ভীত,

ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দেখতে পেতে। এই দৃষ্টান্তকে মানুষের জন্য আমি বর্ণিত করেছি, যাতে তারা চিন্তা করে।' (৫৯ : ৩ : ৪)

ক্রমশ অবতীর্ণ হওয়া

মুসলমানী বিচারানুসারেও সম্পূর্ণ কোরাণ, মাহানুভব মুহম্মদেরও একবারে হৃদয়স্থ হয়নি। কোরাণেই বলা হয়েছে—

'যতক্ষণ পর্যন্ত না তার (কোরাণের) অবতীর্ণ হওয়া সম্পূর্ণ হয়, তার প্রাপ্তির জন্য ব্যস্ত হয়ো না।' (২০ : ৬ : ১০)

সর্বপ্রথম 'হিরা' পর্বতের গুহাতে 'ইক্রা বি ইস্মি রব্বিক' (আপন প্রভুর নামে পড়ো) এই বাক্য প্রথম মহাত্মা মুহম্মদের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। এই সময়কাল ৬৬৭ বিক্রম সম্বতের সমসাময়িক। এই সময় নবী মুহম্মদের বয়স চল্লিশ বছর। প্রতিবছরেই একান্ত চিন্তার জন্য তিনি ওই গুহাতে যেতেন। এই ঐশী জ্ঞান হৃদয়স্থ হওয়াকেই গ্রন্থের অবতীর্ণ হওয়া বলে। গ্রন্থের অবতীর্ণ হওয়ার বিষয়েও ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা আছে। সেজন্য সর্বমান্য মত হিসাবে পবিত্র কোরাণ থেকেই কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

'অবশ্যই কোরাণ আল্লাহ্ অবতীর্ণ করেছেন এবং তার সঙ্গে একজন আপ্তও (দেবদূত) নেমেছিল।' (২৬ : ১১ : ২-৩)

এই আপ্ত বা দেবদূত আর কেউ নয়। দেবদূতদের প্রধান জিব্রাইল। সে-ই হজরতের কাছে গ্রন্থ নিয়ে আসত। দেবদূত কিংবা ফেরেস্তাদের সম্বন্ধে নানা ধরনের কাহিনী ইসলামী সাহিত্যে প্রচারিত আছে। যেমন বৃহদাকৃতি, একাধিক শিং যুক্ত ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে পবিত্র কোরাণে এধরনের বর্ণনা কোথাও পাওয়া যায় না। কোরাণ-এর আবির্ভূত হওয়ার জন্যই রমজান মাসকে অত্যন্ত পবিত্র মাস বলা হয়েছে। সেজন্যই বলা হয়েছে—

রমজান সময়ে অবতীর্ণ হওয়া বিভাগ

'পবিত্র রমজান মাসে, পথপ্রদর্শক, মানব-শিক্ষক, (সত্যাসত্য) বিভাজক, সুস্পষ্ট গ্রন্থ কোরাণ অবতীর্ণ হয়েছিল। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই পবিত্র মাসকে প্রত্যক্ষ করবে সে যেন উপবাস (রোজা) রাখে, আর যে ব্যক্তি পীড়িত কিংবা ভ্রমণ পথে রয়েছে, সে অন্য কোনো দিন।' (২ : ২৩ : ৩)।

'রমজান' আরবীর নবম মাস। রমজান শব্দের অর্থ যার মধ্যে গ্রীষ্মের আধিক্য বর্তমান অথবা গ্রীষ্মের আধিক্যযুক্ত। যে রাত্রিতে গ্রন্থটি প্রথম অবতীর্ণ হয়েছিল সেই রাত্রি রমজান মাসের শেষ দশদিনের একটি 'লৈলতুল্কদ্র' অথবা মহিমান্বিত রাত্রি নামে বিখ্যাত। (৯৭ : ১ : ১)। সেই বিশেষ রাত্রি সহ সারা

মাসটিকেই ইসলামে অত্যন্ত পবিত্র গণ্য করা হয়, কারণ ওই সময়েই কোরাণের অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়। 'কদ্র' নামে কোরাণে একটি অধ্যায়ও (সুরা) যুক্ত আছে।

কোরাণ সংগ্রহ

একথা আগেই বলা হয়েছে যে সম্পূর্ণ কোরাণ একসঙ্গে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়নি। হজরত মুহম্মদের চল্লিশতম বছরে গ্রন্থের অবতীর্ণ হওয়া আরম্ভ হয় এবং তাঁর তেষট্টি বছর বয়স (দেহবসানের সময়কাল) পর্যন্ত অর্থাৎ তেইশ বছর ধরে ক্রমশ ক্রমশ অবতীর্ণ হয়। আবির্ভাব কালেই সম্পূর্ণ কোরাণের গ্রন্থরূপে সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়। বাক্য এবং অধ্যায়ও আপন আবির্ভাবের সময়ের ক্রমানুসারে বর্তমান কোরাণেও স্থাপিত করা হয়নি। কোরাণের অনেক বাক্য মক্কাতে এবং অনেক বাক্য মদীনাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। যে জন্য কোরাণের ১১৪টি অধ্যায় 'মক্কী', এবং 'মদনী' এই দুই ভেদে বিভক্ত। কোরাণ দেখলে অবশ্য মনে হয় না যে তার মধ্যে এই প্রভেদ সম্বন্ধে কোনো বিশেষ মনযোগ দেওয়া হয়েছে। প্রথম দিক থেকে ধরলে একেবারে শেষের দিকের অধ্যায়গুলি আয়তনে যথেষ্ট ক্ষুদ্র। প্রথম অধ্যায় 'ফাতিহা' মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছিল তার পরের অধ্যায় 'অল্বক্রা' অথবা বক্রা (বক্র, বক্রত) মদীনাতে অবতীর্ণ হযেছিল। এর পরের অধ্যায় 'আল্-ইমরান' ও মদনী। অতএব, একথা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায় যে মহাত্মা মুহম্মদের জীবদ্দশায় পবিত্র কোরাণ বর্তমানের গ্রন্থক্রমের মতো সম্পাদিত হয়নি। কোরাণে বর্ণিত 'কিতাব' শব্দটিও কোরাণের বর্তমান রূপের প্রতি কোনো সংকেত নির্দেশ করে না বরং শব্দটি সেদিকেই ইঙ্গিত করে যেখানে বলা হয়েছে এই স্বর্গীয় গ্রন্থ 'লৌহমহফুজ'-এ সুরক্ষিত ছিল। মহাত্মা মুহম্মদের জীবনকালেই পবিত্র কোরাণের এক একটি বাক্যকে অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে রেশম, চর্ম কিংবা অস্থির ওপরে লিখে রাখা হতো। অনেক ভক্তজন তাকে কণ্ঠস্থ করেও নিয়েছিল। এইভাবে সমগ্র কোরাণ শরীফ অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থাতে ছিল। পরবর্তীকালে যখন পাঠ এবং বাক্যের মধ্যে প্রভেদ দেখা যেতে লাগল তখন চতুর্থ খলিফা ওসমান সমগ্র কোরাণ শরীফকে একটি গ্রন্থাকারে সংকলিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। তবে এই সংগ্রহের প্রামাণিকতার বিষয়ে অনেক রকমের মতভেদ আছে। সেই সময় খলিফা বা উত্তরাধিকারী হওয়ার জন্য মহাত্মা মুহম্মদের অনুগামীদের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়েছিল। সেই বিবাদ বাড়তে বাড়তে এক সময় মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধের আগুন জ্বলে ওঠে। সেই গৃহযুদ্ধে আগুনে মহাত্মা মুহম্মদের প্রিয় কন্যা ফাতিমা এবং জামাতা বীরশ্রেষ্ঠ আলির পুত্র হাসান এবং হোসেনের মৃত্যু হয়। এই বিবাদের প্রধান বিষয় ছিল মহাত্মা মুহম্মদের উত্তরাধিকারী কারা

হবে, তাঁর রক্ত সম্বন্ধের আত্মীয়রা না ধর্মসম্পর্কীয়রা? যারা মহাত্মার রক্ত সম্পর্কীয়দের মধ্য থেকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচনের পক্ষপাতী ছিল তারা শিয়া গোষ্ঠী নামে পরিচিত হয় আর তার বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা (যারা ছিল সংখ্যায় অধিক) তারা স্থন্নী নামে পরিচিত হয়। মহাত্মার কোনো জীবিত পুত্র ছিল না। কন্যাদের মধ্যে শ্রীমতী ফাতিমার দুটি পুত্র ছিল হাসান এবং হোসেন। তাঁরা কিছু মুসলমানদের স্বার্থসিদ্ধির পথে বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, অতএব তারা ওই ভ্রাতৃদ্বয়কে নানাভাবে আঘাত করে, অবশেষে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে ক্ষান্ত হয়। বর্তমানে যে রূপে আমরা কোরাণ শরীফকে দেখতে পাই তা সংকলিত হয়েছে খলিফা ওসমানের সময়ে। খলিফা ওসমান ছিলেন স্থন্নী মতাবলম্বীদের মুখ্য প্রবক্তা। শিয়া গোষ্ঠীর বক্তব্য এই যে সংকলিত কোরাণে অনেক বাক্য এবং অধ্যায় গৃহীত হয়নি। উদাহরণ স্বরূপ তারা 'সিজ্‌দা' অধ্যায়ের অনেক বাক্য উপস্থিত করে। প্রাচীন ভাষ্যকারেরাও তা থেকে অনেক বাক্যকে নানা জায়গায় উদ্ধৃত করেছেন। পাটনা শহরের খোদাবক্স লাইব্রেরীতে একটি প্রাচীন হস্তলিখিত কোরাণের প্রতিলিপি আছে, যার মধ্যে এ ধরনের অনেক বাক্যের সংগ্রহ রয়েছে। বর্তমান কোরাণ তিরিশটি 'সিপারো' কিংবা খণ্ডে বিভক্ত, অনেকে বলে থাকেন এর আগে এর সংখ্যা ছিল চল্লিশ। অতএব।

বাক্য পরিবর্তন

অধ্যায় 'অন্বক্র'তে এসেছে—

'যে আয়াতকে (বাক্য) আমি স্থানান্তরিত অথবা পরিবর্তিত করেছি অবশ্যই তার সমতুল্য কিংবা তার চেয়ে উত্তম আয়াত এনেছি। তুমি কি জানো না যে ঈশ্বর সর্ব বিষয়েই সর্বশক্তিমান।' (২ : ১৩ : ৩)

'যখন আমি একটি আয়াতের জায়গায় আরেকটি আয়াত পরিবর্তিত করি, তখন জেনেই করি। ঈশ্বর যা কিছু পরিবর্তন করেন তাকে ভালো করেই জানেন।' (১৬ : ১৪ : ১)

কোরাণের অনেক বাক্য যা একসময় মাননীয় মনে করা হলেও পরবর্তীকালে তার জায়গায় অন্য অনুজ্ঞা এসেছিল। এই ঘটনাকেই উপরোক্ত বাক্যে সমর্থন করা হয়েছে। এর তাৎপর্য ঈশ্বরের আজ্ঞা দেশ, কাল অনুসারে হয়ে থাকে। একসময় মূসা কিংবা ঈসাকে প্রদত্ত ঐশী জ্ঞানের কিছু অংশ সময়ের প্রভাবে উপযুক্ততা হারিয়ে ফেলে, যার ফলে পরবর্তীকালে অন্য ঈশ্বরদূতের প্রয়োজন হয়ে পড়ে যিনি নতুন করে মানুষের মধ্যে আবার ঈশ্বরের বাণী বহন করে আনবেন। ঠিক এইভাবেই মহাত্মা মুহম্মদের কাছে প্রেরিত বাণীরও কিছু কিছু অংশ সময়োপযোগী না থাকার জন্য ঈশ্বর তাকে পরিবর্তিত করেছেন।

মানুষ প্রথমে এক জাতি ছিল

'তিনি (ঈশ্বর) আদমকে সম্পূর্ণ জ্ঞান শিক্ষা দেন।' (২ : ৪ : ২)

'সব জাতির জন্যই ঈশ্বর-প্রেরিতরা এসেছেন।' (১০ : ৫ : ৬)

'কানন্নাস্থ উম্মতিন্ বাহিদতিন্' (সমগ্র মনুষ্য সমাজ একজাতিভুক্ত ছিল) এই বাক্যের মধ্যে এই তত্ত্বকেই সমর্থন করা হয়েছে যে প্রথমে মানুষ একই জাতির মধ্যে ছিল এবং তাদের শিক্ষা দেবার জন্য সকল মানুষের আদি পিতামহ আদমকে (প্রথম মানব) ঈশ্বর জ্ঞানের উপদেশ দিয়েছিলেন। পরে যখন মানুষ অনেক জাতিতে বিভক্ত হয়ে যায়, তখন ঈশ্বর প্রত্যেক জাতির জন্য প্রত্যেক জাতির মধ্যে ঐশ্বরিক দূত প্রেরণ করেন। এর আরেকটিও কারণ ছিল, কারণ এতদিনের ব্যবধানে সেই প্রাচীন জ্ঞান ও শিক্ষার অনেকটাই মানুষ ভুলে গিয়েছিল অথবা অদল বদল করে নিয়েছিল।

কোরাণ প্রাচীন শাস্ত্রের সমর্থক

'হে মুহম্মদ, তোমার কাছে সত্য সংযুক্ত গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে যা পূর্ববর্তী গ্রন্থের সমর্থক। যিনি ইতিপূর্বে মানব কল্যাণের জন্য পথপ্রদর্শনকারী গ্রন্থ তৌরাত এবং ইঞ্জীল অবতীর্ণ করেছিলেন, তিনিই পবিত্র কোরাণও অবতীর্ণ করেছেন।' (৩ : ১ : ৩)

'বলো, যা কিছু আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাইল-সন্তানদের প্রতি, মূসা, ঈসা এবং অন্যান্য ঋষিগণের প্রতি ঈশ্বরের কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তাদের কাউকে পৃথক করি না। আমরা সকলের ওপরে এবং ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস রাখি।' (৩ . ৯ : ৪)

অথবা কিছুটা অন্যভাবে—

'তোমরা বলো আমরা ঈশ্বরের প্রতি, এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে যা একদা অন্যান্য নবীদের প্রতি তাঁদের প্রতিপালকের কাছ থেকে অবতীর্ণ হয়েছিল, আমরা তার সমস্ত কিছুর ওপরেই বিশ্বাস স্থাপন করি, এবং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ করি।' (২ : ১৬ : ৭)

উপরোক্ত কোরাণ-বাক্য প্রতিটি মুসলমানকে এই শিক্ষাই দেয় যে তারা যেন পৃথিবীতে সমস্ত ঋষিদের শিক্ষার ওপরে শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস রাখে। পৃথিবীতে প্রায় সমস্ত মহাপুরুষরা একই কথা বলেছেন যে তাঁরা কোনো নতুন তত্ত্ব প্রচার করছেন না। তাঁরা সেই সনাতন মতবাদকেই প্রচার করছেন যা কালের প্রভাবে মানুষ বিস্মৃত হয়েছিল।

এখানে কোরাণের বর্ণনশৈলী সম্বন্ধে কিছু লেখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গদ্য হলেও এর রচনাশৈলী অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। প্রাচীন মহাপুরুষ এবং রাজাদের উপদেশপ্রদ ইতিহাস কোরাণে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। তাছাড়া

ছোট ছোট উদাহরণ, প্রবচন ইত্যাদির সুপ্রয়োগ জায়গায় জায়গায় করা হয়েছে। 'আমি তোমার কাছে সুন্দর কাহিনী বয়ান করছি। তুমি (মুহম্মদ) অজ্ঞানীদেরই একজন ছিলে। কিন্তু আমি তোমার কাছে কোরাণ অবতীর্ণ করেছি।'

(১২ : ১ : ৩)

কোথাও কোথাও নাস্তিকদের (কাফির) এবং আরও অন্যান্যদের আক্ষেপের উত্তরও দেওয়া হয়েছে—

'কাফিরেরা বলে যদি তারা (মুসলমান) আমাদের কথা শুনত তাহলে নিহত হতো না। বলো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে মৃত্যুকে নিজেদের ওপর থেকে সরিয়ে নাও।' (৩ : ১৭ : ১৩)

ইসলাম বিরোধীদের বিদ্বেষ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

ঈশ্বর সত্তা বর্ণন

'তারা চায় যে ফুৎকার দিয়ে ঈশ্বরের প্রকাশকে নির্বাপিত করে দেবে, কিন্তু প্রভু প্রকাশকে সম্পূর্ণ উদ্‌ভাসিত না করে থাকেন না, তাতে নাস্তিকেরা (কাফির) যতই মনক্ষুণ্ণ হোক না কেন।' (৯ : ৫ : ৩)

ঈশ্বরের অচিন্তনীয় নির্মাণ কৌশল সম্বন্ধে নিম্নে বর্ণনা করা হয়েছে।

'তাদের জন্য তুমি একটি জাগতিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করো। আমি আকাশ থেকে জল নামিয়েছি অতঃপর তা থেকে বনস্পতির জন্ম হয়েছে। পরে তা আবার কণায় পরিণত হয়েছে যাকে বায়ু এদিক ওদিক উড়িয়ে নিয়ে যায়। ঈশ্বর সর্ব বিষয়েই সর্ব শক্তিমান।' (১৮ : ৬ : ১)

ঈশ্বর সত্তা সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে—

'ঈশ্বর আকাশ এবং পৃথিবীর আলো। তাঁর আলোর উপমা—তাকের ওপরে একটি জ্বলন্ত প্রদীপ, প্রদীপটি একটি কাঁচের আবরণের মধ্যে অবস্থিত, কাঁচের আবরণটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত হয় পবিত্র 'জয়তুন' বৃক্ষের তেল থেকে যা প্রাচ্য কিংবা প্রতীচ্য কারোরই নয়। যদিও তাতে আগুনের ছোঁয়ামাত্র লাগেনি, শুধুমাত্র সমীপবর্তী হয়েছে, তাতেই তেল প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছে। আলোর ওপরে আলো। ঈশ্বর তাঁর জ্যোতি থেকে যাকে ইচ্ছা করেন শিক্ষা দেন। ঈশ্বর মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন। ঈশ্বর সর্ববিষয়েই সর্বজ্ঞ।'

(২৪ : ৫ : ১)

প্রবচন

বেশী বিস্তার না করে কয়েকটি প্রবচন উদ্ধৃত করা হলো।

'বঞ্চনা হত্যার চেয়েও বেশী।' (২ : ২৭ : ১)

'সংসারের সমস্ত প্রাণীই মৃত্যুর অধীন…'

'সংসার-জীবন ব্যর্থ অভিমানের অতিরিক্ত আর কিছু নয়।' (৩ : ১৯ : ৪)

'মানুষ সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল।' (৪ : ৫ : ৩)

'লা অলর্‌সুলি ইল্লল্‌ বলাগ (পৌঁছে দেওয়া ব্যতিরেকে দূতের আর কোনো কর্তব্য নেই।)'

'মানুষ প্রকৃতপক্ষে দুর্বল হৃদয়ে সৃষ্ট।' (৭০ : ১ : ১৯)

কোরাণের মনোরম রচনা, সুন্দর শব্দ ব্যবহারের জন্য একটি প্রবচন প্রচলিত আছে যে বিষয়ে স্বয়ং কোরাণে এইভাবে বর্ণিত হয়েছে।

'কি বলছে তারা? এটি তাঁর (হজরত মহম্মদ) স্বরচিত। ওদের বলো ঠিক এরকম কোনো সুরা (অধ্যায়) তোমরা রচনা করে আনো এবং তার জন্য ঈশ্বর ব্যতিরেকে যাকে খুশী সাহায্যের জন্য আহ্বান করতে চাও করো, অবশ্য যদি তোমরা সাচ্চা হও।' (১০ : ৪ : ৮)

মহাত্মা মুহম্মদ বলতেন, আমি যা কিছু কোরাণের বাণী শোনাচ্ছি। তার সমস্তটাই ঈশ্বর আমার কাছে পাঠিয়েছেন। কিন্তু বিরোধীরা বলত তিনি মিথ্যাবাদী। তারা বলত মুহম্মদ এগুলি নিজে রচনা করে তারপর সেগুলিকে ঈশ্বরের সৃষ্ট বলে দাবি করে। সেই অপবাদ সম্বন্ধে উপরোক্ত বাক্যে উত্তর দেওয়া হয়েছে। এই বাক্য কোরাণ শরীফে অনেকবার এসেছে। এ বিষয়ে আরও বলা হয়েছে—

প্রাচীন বাক্যের প্রামাণিকতা

'যদি মানুষ এবং জিন একত্রিত হয়ে, একে অপরের সাহায্যকারী হয়ে কোরাণের মতো একটি গ্রন্থ রচনা করতে চায়, তাহলেও তারা তাতে সফল হবে না।'

(১৭ : ১০ : ৪)

উপরোক্ত বাক্যটি পাঠকদের আগামী অধ্যায়গুলিতে প্রচুর সহায়তা করবে। কোরাণের সমস্ত মধ্যম পুরুষ এবং একবচনে প্রযুক্ত বাক্য স্বয়ং মহাত্মা মুহম্মদকে সম্বোধিত করে এবং বহুবচনে উদ্ধৃত বক্তব্য প্রধানত মুসলমান কিংবা নাস্তিকদের সম্বোধিত করে বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি কথা অবশ্যই স্মরণে রাখা উচিত যে কোরাণের পঠন-পাঠন প্রণালী নিরবচ্ছিন্নভাবে একই রূপে আজ পর্যন্ত চলে এসেছে। কাল পরিবর্তন, রাষ্ট্রবিপ্লব এবং বিজেতাদের ধর্মান্ধতা যেমনভাবে হিন্দু এবং ইহুদীদের ধর্ম সাহিত্যের অধিকাংশকেই বিনাশ করতে সক্ষম হয়েছে। সেরকম মুসলমানদের ধার্মিক গ্রন্থের বেলায় হয়নি। সেজন্যই কোরাণ শরীফের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য পরম্পরাগত ভাষ্য, এবং শব্দরহস্যকে বোঝা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কোরাণ শরীফের প্রতিটি বাক্য কোনো না কোনো বিশেষ দেশ, কাল এবং ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে এ বিষয়ে আমরা

আরও বিশদভাবে জানব। এই সম্বন্ধগুলিকে জানার জন্য সেই ধারাবাহিকতাই (পরম্পরা) একমাত্র সাহায্যকারী। অতএব সেই ধারাবাহিকতাকে বাদ দিয়ে কোনো মনগড়া অর্থ ব্যাখ্যা করে এরকম কোনো টীকা ভাষ্য কখনোই মাননীয় হতে পারে না।

তৃতীয় বিন্দু

কোরাণ এবং তার সমসাময়িক

মক্কাবাসীদের কাছে আপন ধর্মশিক্ষার প্রচার করার সময় কাবার পুরোহিত সম্প্রদায়ের অন্যতম কুরেশীরা মহাত্মা মুহম্মদকে নানা ধরনের কষ্ট দিয়েছিল। যখন তাঁর খুল্লতাত-এর মৃত্যুর পর সেই শত্রুতা আরও অধিক মাত্রায় বেড়ে গেলো, এমনকি তারা মহাত্মার প্রাণনাশের চেষ্টায়ও ব্রতী হলো তখন বাধ্য হয়ে মহাত্মা মুহম্মদ মক্কা ত্যাগ করে মদীনাকে তাঁর নিবাস স্থল হিসাবে বেছে নেন। এই প্রবাসের তিথি থেকেই মুসলমানদের হিজরী সম্বতের আরম্ভ হয়। কোরাণে এই সমস্ত মূর্তি পূজকদেরই কাফির অথবা নাস্তিক বলা হয়েছে। সেই সময় মদীনা নগরে প্রচুর সংখ্যায় ইহুদীদের বাস ছিল এবং ব্যবসা বাণিজ্যে তাদের চাতুর্যের কারণে তারা বেশ বিত্তবান এবং প্রভাবশালী ছিল। মদীনার কোনো কোনো অঞ্চলে খৃস্টানদের বসতি ছিল। এর ফলে মহাত্মা মুহম্মদ এই দুই ধর্মেরও সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। এই দুই ধর্মের অনুগামীদের কথা কোরাণ শরীফেও উল্লিখিত হয়েছে। তাছাড়া তিনি এরকম কিছু লোকের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন যারা মূর্তি পূজকদের পরিবারে জন্মগ্রহণ করলেও ব্যক্তিগতভাবে মূর্তি পূজার প্রতি কোনো শ্রদ্ধা রাখত না, এবং তারা ইহুদী বা খৃস্টান কোনো ধর্মেরই অনুগামী ছিল না। এদের মধ্যে সায়দা-পুত্র কয়েস, হজশ-পুত্র আবদুল্লাহ্, হবারিস-পুত্র ওসমান এবং অমরু-পুত্র জৈদ প্রসিদ্ধ। এরা মহাত্মা মুহম্মদের শিক্ষাকে উত্তম বলে মনে করত, কিন্তু নিজেরা ইসলাম ধর্মকে তখনো স্বীকার করেনি। মহাত্মা মুহম্মদের শ্যালক খাদিজা বিবির ভ্রাতা নৌফলের পুত্র বর্কও ইসলামের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল।

ইহুদী

ইহুদী ধর্মের মহাত্মা ইব্রাহিম, ইসহাক, দাউদ, সুলেমান প্রভৃতি কোরাণেরও মাননীয় মহাত্মা এবং রসুল (ঈশ্বর প্রেরিত)। নিজেদের বংশগরিমার প্রতি অত্যন্ত অভিমানী ইহুদীরা মহাত্মা মুহম্মদের মদীনাতে (যস্রীব) আসার পর কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর কোনো সক্রিয় বিরোধিতা করেনি। পরে যখন দেখল তাদের প্রভাব দ্রুত কমছে এবং মহাত্মা মুহম্মদের প্রভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন তারা তাঁর বিরোধী হয়ে গেলো। ইসলাম ধর্মের অনেক কিছু ইহুদী এবং খৃস্টান ধর্ম থেকে গৃহীত হয়েছে। প্রথম থেকেই মহাত্মা মুহম্মদ এই দুই ধর্মের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান ছিলেন। এমনকি মুসলমানরা ইহুদীদের পবিত্রস্থান জেরুজালেমের দিকে মুখ করেই প্রথম দিকে নামাজ পড়ত। কিন্তু যখন ইহুদীরা

মুসলমানদের শত্রুতা করতে উদ্যোগী হলো তখন মহাত্মা মুহম্মদ তাঁর অনুগামীদের জেরুজালেমের পরিবর্তে কাবাকে আপন কিবলা (সম্মুখস্থ জায়গা) বানাবার আদেশ দেন। ইহুদীদের ব্যবহারের বিষয়ে কোরাণ শরীফে বলা হয়েছে—

'ইহুদীদের মধ্যে কিছু লোক ঈশ্বর-বাক্য (কোরাণ) শোনে। তারপর যা কিছু তারা জেনেছিল তাকে পরিবর্তিত করে দিয়ে বলে এটাই আমরা জেনেছিলাম।' (২ : ৯ : ৪)

'ইহুদীরা বাক্যকে তার জায়গা থেকে পরিবর্তিত করে।' (৪ : ৭ : ৪)

মহাত্মা মুহম্মদ এবং তাঁর অনুগামীদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইহুদী সম্প্রদায়ের গ্রন্থে মুহম্মদের রসুল (ঈশ্বর প্রেরিত) হয়ে আসার ভবিষ্যদ্বাণী আছে কিন্তু ইহুদীরা তাকে বদলে দিয়ে অন্যকথা প্রচার করে, কারণ তারা আশংকা করে যে ওরকম না করলে ইসলামের ভিত্তি আরও দৃঢ় হয়ে যাবে। উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় বাক্যে সেই দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়া অন্য আক্ষেপও ইহুদীদের সম্পর্কে করা হয়েছে। যেমন—

'তারা সামান্য কিছু ধনপ্রাপ্তির আশায় নিজ হস্তে গ্রন্থ রচনা করে বলে, তা ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত। তাদের জন্য ধিক্কার এবং শাস্তি অপেক্ষমান।'

(২ : ৯ : ৮)

'কোনো কোনো ইহুদী চায় যে তোমাদের (মুসলমান) তারা পথভ্রষ্ট করে দেবে কিন্তু তোমরা জানো না যে ওরকম কাজ তারা নিজেদের ছাড়া অন্য কারো প্রতি করতে সক্ষম নয়। হে গ্রন্থ প্রাপক গণ! [এখানে গ্রন্থ প্রাপক বলতে ইহুদীদেরই বোঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে মূসা, দাউদ প্রভৃতি রসুলেরা (ঈশ্বর প্রেরিত) তৌরাত, জবুর প্রভৃতি ঐশী গ্রন্থ পেয়েছিলেন।] তোমরা তো সাক্ষী আছ, তবু কেন ঐশী বাণীতে (কোরাণ শরীফ) বিশ্বাস রাখো না? হে গ্রন্থ প্রাপকগণ! তোমরা জেনেশুনে সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকতে চাও কেন?' (৩ : ৭ : ৬-৮)

কোরাণ এবং ইহুদী ধর্মের মধ্যে অনেক মিল আছে। তাছাড়া উভয় ধর্মই মূর্তি পূজার ঘোরতর বিরোধী। তা সত্ত্বেও বিদ্বেষ প্রসূত হয়ে ইহুদীরা মুসলমানদের চেয়ে মূর্তিপূজকদেরও ভালো মনে করে। যেমন—

'হে মুহম্মদ? তুমি কি তাদের লক্ষ্য করনি যারা বলে বিশ্বাসীদের (মুসলমান) চেয়ে নাস্তিকেরা (কাফির) অধিকতর সুপথে আছে। এভাবে নাস্তিকদের প্রশংসাকারী মূর্তি এবং শয়তানের প্রতি আস্থা স্থাপনকারীরা যদিও গ্রন্থের কিয়দংশ পেয়েছিল।' (৪ : ৮ : ১)

মহাত্মা মুহম্মদ ইহুদীদের যথার্থ আস্তিক মনে করে কেবলমাত্র মুসলমানদের প্রতি প্রযুক্ত হওয়া বাক্য 'আস্‌সলামু অলৈকুম্' (তোমার মঙ্গল হোক) বলে ইহুদীদেরও নমস্কার জানাতেন কিন্তু ঈর্ষাবশত ইহুদীরা প্রত্যুত্তরে 'অস্‌সামু-অলৈকুম' কিংবা 'ব অলৈকমু স্‌সামু' (তোমার প্রতি মৃত্যু আসুক) এই দুর্বাক্য বলত।'

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থকে কোরাণেও ঐশীগ্রন্থ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। মুসলমানদের এই স্বীকৃতির সুযোগের অপব্যবহার করে ইহুদীরা তাদের প্রবঞ্চনা করত।

'যাতে তোমরা ওটিকেও একটি ঐশীগ্রন্থ মনে করো সেজন্য তারা গ্রন্থকে জিহ্বা দ্বারা বিকৃত করে এবং বলে সেটি ঈশ্বরের কাছ থেকে আগত, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাদের কথাগুলি না এসেছে ঈশ্বরের কাছ থেকে, অথবা না এসেছে গ্রন্থ থেকে।' (৩ : ৮ : ৭)

যখন ইহুদীদের বলা হতো যেভাবে তোমরা মূসা, ইব্রাহিম প্রভৃতি মহাত্মাদের ঈশ্বর প্রেরিত (রসুল) মনে করো, মহাত্মা মুহম্মদকে কেন সেরকম মনে করো না। তখন তারা বলত—

'ঈশ্বর আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে যতক্ষণ কেউ তেমনতর বলি সঙ্গে নিয়ে না আসে যাকে অগ্নি (স্বয়ং) ভক্ষণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা তাকে ঈশ্বর প্রেরিত বলে বিশ্বাস করো না।'

যার উত্তরে আবার বলা হয়েছে—

'বলো আমার পূর্বে কতজন রসুল (ঈশ্বর প্রেরিত) চিহ্নসহ এসেছেন। যদি তোমারা প্রকৃত সত্যবাদী হয়ে থাক তাহলে তোমরা তাদের হত্যা করলে কেন ?'
(৩ : ১৫ : ৩)

উপরোক্ত বাক্যে 'জক্রিয়া' ইত্যাদি ইহুদী রসুলদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে ধরা যেতে পারে, কারণ তিনি দিব্য প্রমাণসহ পৃথিবীতে এসেছিলেন কিন্তু ইহুদীরা তাঁকে হত্যা করে।

শত্রুতা বৃদ্ধির পর থেকে ইহুদীদের গুপ্তচরেরা মহাত্মা মুহম্মদের শিক্ষাদানের এবং অন্যান্য আলোচনা স্থলে গিয়ে সংবাদ সংগ্রহ করে তাদের গোষ্ঠীপতিদের জানাত। সেখান থেকে মক্কাস্থিত শত্রুদের কাছেও খবর চলে যেত। এই সমস্ত শত্রুদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—

'কাছে আসা অবৈধ ভক্ষণকারী ভণ্ড দূতদের বলো যে তারা যেন না আসে অথবা তাদের উপেক্ষা করো। তাদের উপেক্ষা করলে তারা তোমার কোনো হানিই করতে সক্ষম হবে না।' (৫ : ৬ : ৮)

বালক বয়সে একবার খৃস্টান সন্ন্যাসী বহেরার সঙ্গে মহাত্মা মুহম্মদের সাক্ষাৎ হওয়ার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। যৌবনে আরেকবার সেই মহাপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। এরকম একজন তেজস্বী, সদাচারী মহাত্মার সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হবার ফলে তিনি খৃস্ট ধর্মের অনুগামীদের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলেন। কোরাণ শরীফে বলা হয়েছে—

'ইহুদী এবং কাফিরদের মধ্যে অনেক ক্রুর প্রকৃতির মানুষকে পারে, কিন্তু যারা নিজেদের খৃস্ট অনুগামী বলে, তাদের মধ্যে অনেককে তোমরা সৌহার্দপূর্ণ

ব্যবহারের মধ্যে পাবে কারণ তাদের মধ্যে অনেক নিরহঙ্কার জ্ঞানী সন্ন্যাসী আছেন।' (৬ : ২ : ৫)

খৃস্টানদের তেমন কোনো অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা তখন ছিল না যার জন্য মুসলমানদের সঙ্গে তাদের বিরোধ হতে পারে। যদিও খৃস্টানদের সম্বন্ধে এধরনের প্রশংসাবাক্য বলা হয়েছে কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তাদের মতামতকে কোরাণে খণ্ডন করা হয়নি। খৃস্টান ধর্মে ঈশ্বরকে তিনটি রূপে স্বীকার করা হয়। (১) পিতা যিনি স্বর্গে বাস করেন, (২) পুত্র—প্রভু যীশুখৃস্ট যিনি জীবজগতের হিতার্থে কুমারী মরিয়মের গর্ভে অবতার রূপে জন্ম নিয়েছিলেন, এবং অজ্ঞানী ও অন্যায়কারীরা তাঁকে ক্রুশে চড়িয়েছিল, (৩) পবিত্র আত্মা—যা ভক্তজনেব হৃদয়ে প্রবেশ করে তাদের মুখ কিংবা শরীরের দ্বাবা ত্রিকাল সম্বন্ধী জ্ঞান কিংবা অন্যান্য ধার্মিক রহস্যেব উন্মোচন করে। এই বিষয়ে পবিত্র কোরাণে বলা হয়েছে—

'ঈশ্বর তিনটির মধ্যে একটি এরকম যাবা বলে তাবা নাস্তিক। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।' (৬ : ১০ : ৭)

'মরিয়ম-পুত্র ঈসা (যীশু) পূর্বের প্রেরিতদের মতোই একজন প্রেরিত, তাব অতিরিক্ত কিছু নন, তাঁর মাতা একজন সতী রমণী ছিলেন। উভয়েই আহার্য গ্রহণ করতেন। দেখ আমি (ঈশ্বর) কিভাবে যুক্তি বর্ণনা করি, কিন্তু খৃস্টানরা সে বিষয়ে বিমুখ।' (৬ : ১০ : ৮)

প্রবঞ্চক [মুনাফিক]

মহাত্মা মুহম্মদের মদীনা আগমনের পর যে সমস্ত মূর্তিপূজক ইসলাম ধর্ম স্বীকাব করেছিল তাদের বলা হতো আন্সার। এদের মধ্যে অনেক প্রবঞ্চক মুসলমানও ছিল যাদের বলা হয়েছে মুনাফিক। এদের বিষয়ে বলা হয়েছে—

'আমরা নির্ণয় দিন (কেয়ামত) এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখি—একথা বললেও তাদের অনেকে বিশ্বাসী (মুসলমান) নয়। ঈশ্বর এবং মুসলমানদের তারা প্রতারণা করছে মনে ভাবলেও প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদেরকেই প্রতারণা করছে।' (২ : ২ : ১, ২)

'তারা যখন বিশ্বাসীদের (মুসলমান) কাছে যায় তখন তারা বলে, আমরাও বিশ্বাসীদের দলভুক্ত। তারপর তারা সেখান থেকে বের হয়ে নাস্তিকদের কাছে যায় তখন তাদের বলে—আমরা প্রকৃতপক্ষে তোমাদের দলে, মুসলমানদের সঙ্গে পরিহাস করি মাত্র।' (২ : ২ : ৭)

'এরা উভয়ের মাঝখানে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, না এদিকে, না ওদিকে।' (৩ : ২১ : ২)

সে জন্যই মৃত্যুর পর—

'নিঃসহায় হয়ে সে নরকাগ্নির সবচেয়ে নীচের স্তরে স্থান পাবে।' (৩ : ২১ : ৪)

কাফির (নাস্তিক)

আগের অধ্যায়গুলিতেই একথা বলা হয়েছে যে মহাত্মা মুহম্মদের সময়ে আরবদেশে মূর্তি পূজার বহুল প্রচার ছিল। পবিত্র কেরোণে মূর্তি পূজার বিরুদ্ধেই সবচেয়ে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে। মহাত্মা মুহম্মদ যখন জানতে পারেন যে কাবা মন্দিরের নির্মাতা এবং তাঁর পূর্বজ মহাত্মা ইব্রাহিম মূর্তিপূজক ছিলেন না, তখন তিনি যেন তাঁর আরব্ধ কাজে নতুন করে বললাভ করলেন। তাঁর ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল যে একদিন কাবা মন্দির মূর্তিশূন্য হবে। তিনি প্রকৃত ঈশ্বরের আরাধনার প্রচার এবং মিথ্যা দেবদেবীর পূজার মত খণ্ডন করাকে জীবনের প্রধান লক্ষ্য বেছে নিয়ে সারা জীবন সেই মতো কাজ করে যান। আরবদেশের 'কাশী' বলা যায় যাকে সেই মক্কা নগরে কুরেশী পাণ্ডাদের প্রভাব তখন দারুণ ছিল। তারা তাদের অনুগামীদের বলত—

'বদ্দ, সুবায়, আগুস্, নস্র প্রভৃতি আপন ইষ্টদেবতাদের কখনোই পরিত্যাগ করা উচিত নয়।' (৭১ : ১ : ২৩)

কোরাণের উপদেশ সম্বন্ধে তারা বলত—

'এসমস্ত এই মুহম্মদের মনগড়া।' (১১ : ৩ : ১১)

'একে কোনো বিদেশী এসমস্ত শিক্ষা দেয় ।...আমরা ভালো করেই জানি সেই শিক্ষা দাতার ভাষা আরবী থেকে ভিন্ন। কিন্তু সত্য এই যে কোরাণের ভাষা সুস্পষ্ট আরবী।' (১৬ : ১৪ : ৩)

তারা মহাত্মার রসুল (প্রেরিত) হওয়া সম্বন্ধে বলত—

'আমরা বিশ্বাস করি না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে মাটি থেকে জলস্রোত সৃষ্টি করে। অথবা যে খেজুর, আঙুর প্রভৃতির এক উদ্যান সৃষ্টি করুক, যার মধ্যে সেচের নালা থাকবে। অথবা তারই কথামতো আকাশকে টুকরো টুকরো করে আমাদের মাথার ওপরে ফেলুক। অথবা ঈশ্বর কিংবা তাঁর প্রতিভূ দেবদূতদের (ফেরেস্তা) কাউকে জামিন হিসাবে আমাদের সম্মুখে আনুক না কেন। কিংবা তার জন্য একটি সুরম্য অট্টালিকা নির্মিত হোক। অথবা সে আকাশে আরোহণ করুক। কিন্তু সে আকাশে আরোহণ করলেও আমরা বিশ্বাস করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা পড়তে পারি এমন কোনো গ্রন্থ নিয়ে না আসে।' (১৭ : ১০ : ৭-১০)

কাফিরদের উক্তি

কোরাণে প্রাচীন রসুলদের (প্রেরিত) সম্পর্কে অনেক চমৎকার বর্ণনা আছে। যেমন মহাত্মা মূসা পাথরের মধ্য থেকে বারোটি জলস্রোত প্রবাহিত করেছিলেন।

তাছাড়া তিনি তাঁর সঙ্গীদের স্বর্গীয় আহার্য 'মন্ন' এবং 'সলবা' ভোজন করিয়েছেন। ইব্রাহিমের কাছে তো খোদাতাল্লা প্রায়শই আসতেন। মহাত্মা ঈসা (যীশু) আকাশে আরোহণ করেছিলেন। এই সমস্ত কথা তুলে মহাত্মা মুহম্মদের বিরোধীরা বলত তুমি যদি প্রকৃত রসুল হয়ে থাকো তাহলে পূর্বজ রসুলদের মতো চমৎকার করে কেন দেখাও না? আরও নানাভাবে তারা মহাত্মাকে উপহাস করত। তাদের সেই ব্যবহারের কিছু উদাহরণ নীচে দেওয়া হলো।

'আহার গ্রহণ করে, বাজারে ঘুরে ফিরে বেড়ায়, এ কেমন রসুল (প্রভু প্রেরিত)! কেন এর কাছে দেবদূতেরা আসে না, এসে আমাদের ভয় দেখায় না? কেন এর কাছে অর্থভাণ্ডার কিংবা বাগ-বাগিচা নেই, যার ও উপভোগ করতে পারত।' (১৫ : ১ : ৩,৮)

'আমরা কি তবে কোনো উন্মাদ, দরিদ্র, তুকবন্দের (কবি) কথায় পড়ে আপন ইষ্টদের ফেলে দেবো?' (৩৭ : ২ : ৩)

সে সময় পশ্চিম আরবের হিজাজ শহরে দু'জন বড় সর্দার ছিল। একজন মক্কার কুরেশ বংশীয় সর্দার আরেকজন তায়ফ বংশীয় সামন্ত। মহাত্মা মুহম্মদও ছিলেন কুরেশ বংশের হাশিম পরিবারের। তারা তত ধনী মানী ছিল না। কুরেশ মূর্তি উপাসকেরা বলত—

ভগবৎ সান্ত্বনা

'উভয় বসতির (মক্কা এবং তায়ফ) কোনো একজন সামন্ত সর্দারেব প্রতি কোরাণ কেন অবতীর্ণ হলো না?' (৪৩ : ৩ : ৬)

কোরাণে বর্ণিত অনেক প্রাচীন মহাত্মাদের কাহিনী শুনে তারা বলত—

'আমরাও এমন বর্ণনা করতে পারি। এর মধ্যে আর নতুনত্ব কোথায়। এ তো সবই পূর্বজদের কাহিনী।' (৮ : ৪ : ৩)

'এ সমস্তই তো পূর্বজদের কাহিনী' এই কথা বার বার কোরাণে কুরেশীয়দের আক্ষেপরূপে এসেছে। এদের উপহাস এবং নিষ্ঠুর ব্যবহারেও মহাত্মা মুহম্মদ নিরাশ হতেন না, তাঁর হৃদয়ে আকাশবাণী হতো—

'তোমার পূর্বেও লোকে অনেক রসুলদের ব্যঙ্গ করেছে তারপরে আবার তাদের কাছেই শরণ নিয়েছিল।' (২১ : ৩ : ১২)

মহাত্মার দৃঢ়তা

উপরের বর্ণনা থেকে এটা ভালোভাবে বোঝা গেছে যে ইসলামের শৈশবে তাকে অনেক ধরনের বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ইসলাম যখন নির্ভীক-ভাবে অন্যদের মিথ্যা বিশ্বাসের খণ্ডন করেছিল তখন তার সমস্ত প্রতিপক্ষরাই নবীন ইসলামকে বিকলাঙ্গ উপায়ে ফেলতে তৎপর হয়েছিল। সত্যি সত্যি

বিরোধিতা যে স্তরের ছিল যদি তখন সময়োচিত দৃঢ়তা মুসলমানেরা এবং তাদের রসুল মহাত্মা মুহম্মদ না দেখাতেন, তা হলে কে বলতে পারে যে আজ যেমন ইসলাম ইতিহাসের অনেক পটপরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে সেরকম করতে তারা সক্ষম হতো কি-না।

চতুর্থ বিন্দু

মহাত্মা মুহম্মদের আত্মীয় পরিজন

পবিত্র কোরাণে অনেক বাক্য মহাত্মা মুহম্মদের পরিবার, ইসলাম ধর্মে তাদের অবস্থান ইত্যাদি বিষয়েও বলা হয়েছে। নিজেদের ধর্ম প্রবর্তককে ঈশ্বর কিংবা তাঁর অবতার বানিয়ে ফেলার একটা প্রবণতা সমস্ত ধর্মের অনুগামীদের মধ্যেই দেখা যায়। সেজন্যই কোরাণ শরীফে বারবার বলা হয়েছে 'মুহম্মদ একজন রসুলের (প্রেরিত) অতিরিক্ত কিছু নন।' (৩ : ১৫ : ১)

মহাত্মা মুহম্মদের ঈশ্বব প্রেরিত হওয়া সম্বন্ধে কোরাণে নিম্নলিখিত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—

'যাদের কাছে 'তৌরাত' (মূসাকে প্রদত্ত ঐশীগ্রন্থ ইহুদীদের ধর্মপুস্তক) এবং 'ইঞ্জীল' (ঈসাকে [যীশু] প্রদত্ত ঐশীগ্রন্থ খৃস্টানদের ধর্মপুস্তক)-এর উদাহরণ আছে, যেখানে পুণ্য কাজ করার উপদেশ এবং পাপকর্ম বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যা পবিত্র বস্তুকে ভক্ষ্য এবং অপবিত্র বস্তুকে অভক্ষ্য বলে বিধান দেয়। যা সেই ধর্মের অনুগামীদের ওপরে চাপানো ভার ও ফাঁদ থেকে তাদের মুক্ত করে। অতঃপর যারা তাঁকে বিশ্বাস করবে ও তাঁকে সম্মান করবে, তাঁর সহায়তা করবে, তাঁর সঙ্গে অবতীর্ণ হওয়া জ্যোতির (পবিত্র কোরাণ) অনুসরণ করবে তারাই পুণ্যের অংশীদার হবে।' (৭ : ১৯ : ৬)

মহাত্মার সম্মান

'আমি মুহম্মদ তোমাদের সকলের কাছে রসুল (ঈশ্বর প্রেরিত), যার শাসন পৃথিবী এবং আকাশ দুই জায়গাতেই বর্তমান।' (৭ : ২০ : ১)

'বলো, আমি তো নতুন কোনো রসুল নই। ঈশ্বর যা কিছু আমার কাছে প্রেরণ করেন আমি তারই অনুসরণ করি। আমি মঙ্গল অমঙ্গলের বার্তা বহনকারীর অতিরিক্ত কিছু নই।' (৪৬ : ১ : ৯)

ইসলামে যদিও মহাত্মা মুহম্মদকে ঈশ্বর কিংবা তাঁর অবতার বলা হয়নি। তার অর্থ এই নয় যে ইসলাম ধর্মে তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং সম্মান কিছু কম ছিল। বলা হয়েছে—

'তোমার (মুহম্মদ) সঙ্গে যারা করমর্দন করে তারা প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের করস্পর্শ করে। মুহম্মদের হাত নয় তাদের হাতে ঈশ্বরের হাত থাকে।'

(৪৮ : ১ : ১০)

ইঞ্জীলে তাঁর জন্য ভবিষ্যদ্বাণী

'হে বিশ্বাসীগণ (মুসলমান) রসুলের (মুহম্মদ) কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চস্বরে চিৎকার করো না। তাঁর সঙ্গে সেভাবে বার্তালাপ করো না, যেরকম তোমরা নিজেদের মধ্যে করে থাক।' (৪৯ : ১ : ২)

'ঈশ্বর এবং দেবদূতেরা রসুলের কাছে আশীর্বাদ প্রেরণ করেন। হে বিশ্বাসী-গণ! তোমরাও তাঁর জন্য আশীর্বাদ ও শান্তি কামনা করো।' (৩৩ : ৭ : ৪)

মুসলমানদের বিশ্বাস ইহুদীদের মতো খৃস্টানদের (ঈসাই) ধর্মগ্রন্থ ইঞ্জীলেও মহাত্মা মুহম্মদের প্রেরিত হয়ে আসার ভবিষ্যদ্বাণী আছে কিন্তু তারা দুরাগ্রহবশত সেই তথ্যকে স্বীকার করে না। কোরাণ শরীফে এই ভাবকে নিম্নলিখিত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে।

'যখন মরিয়ম-পুত্র ঈসা বলেছিলেন—হে ইস্রাইলের সন্তানগণ (ইহুদী) আমি ঈশ্বর প্রেরিত হয়ে তোমাদের কাছে এসেছি। আমার পূর্বে-প্রেরিত গ্রন্থ তৌরাত ইত্যাদিকে প্রামাণ্য বলে স্বীকার করি। আমি আরও একজন ঈশ্বর প্রেরিতের সুসংবাদ দিচ্ছি যার আগমন হবে আমার পরে। তাঁর নাম আহমদ (মুহম্মদ)। অতঃপর তিনি যখন সুস্পষ্ট প্রমাণ সহ উপস্থিত হলেন, তখন তারা বলল, এ তো নিছক যাদু।' (৬১ : ১ : ৬)

মহাত্মা মুহম্মদের প্রাধান্য

মহাত্মা মুহম্মদের কাছে ঐশী বাণী আসার কোনো সুনির্দিষ্ট সময় ছিল না। তাঁর জাগরণে, শয়নে, যে কোনো সময়ে বাণী তাঁর কাছে নামত। একবার যখন মহাত্মা মুহম্মদ লেপ গায়ে শুয়েছিলেন সেই সময়ে ঐশী বার্তা তাঁর কাছে পৌঁছেছিল।

'হে মোদাস্‌সের (বসনাবৃত) ওঠ এবং সতর্কবাণী প্রচার করো।'

(৭৪ : ১ : ১,২)

নিম্নলিখিত বাক্যও ইসলাম ধর্মে মহাত্মা মুহম্মদের প্রাধান্যকে প্রদর্শিত করে—

'হে বিশ্বাসীগণ! ঈশ্বর এবং তাঁর রসুলের আজ্ঞা মানো।' (৪ : ৮ : ৯)

'বিশ্বাসী (মুসলমান) তারাই, যারা ঈশ্বর এবং তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, এবং কোনো সন্দেহ প্রকাশ করে না।' (৪৯ ; ২ : ৫)

মহাত্মা মুহম্মদই শেষ নবী (রসুল—ঈশ্বরদূত)

'যারা ঈশ্বর এবং তাঁর প্রেরিতের আজ্ঞা মান্য করে না, তাদের জন্য সর্বদাই নরকাগ্নি প্রস্তুত থাকে।' (৭২ : ২ : ৪)

মহাত্মা মুহম্মদের আচরণকে আদর্শ মেনে তাকে অন্যদের জন্য অনুকরণীয় বলা হয়েছে—

'তোমাদের জন্য ঈশ্বর প্রেরিতের সুন্দর আচরণ অনুকরণীয়।' (৩৩ : ৩ : ১)

একথা ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার বলা হয়েছে যে মহাত্মা মুহম্মদের সময়ে আরব-দেশ আচার-ব্যবহারে সভ্যতাকে প্রায় পরিহার করেছিল। তাদের ছোটখাটো সভ্যতা সম্বন্ধীয় ব্যবহার থেকে আরম্ভ করে ব্যবহারিক জীবনের বড় বড় বিষয়েও উপযুক্ত সভ্যতা শেখানো প্রয়োজনীয় ছিল। তারা সে সময় পিতা পুত্র, গুরু শিষ্য ইত্যাদি যে কোনো ধরনের ছোট বড় সম্বন্ধ সম্পর্কে যথানুরূপ বিচারবোধ রাখত না। মহাত্মা মুহম্মদকে প্রবর্তক এবং ঈশ্বর প্রেরিত স্বীকার করার পর সমস্ত মুসলমানদের কাছে ওই পরিচয়টাই প্রধান হয়ে দাঁড়ায়, অন্যান্য আত্মীয় সম্পর্ক তারপর থেকে গৌণ হয়ে যায়। যেমন—

'মুহম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়। সে ঈশ্বর প্রেরিত (রসুল) এবং সমস্ত প্রেরিতদের মধ্যে সে অন্তিম প্রেরিত।' (৩৩ : ৫ : ৬)

'মুসলমানদের তাঁর সঙ্গে (মুহম্মদ) প্রাণপ্রিয় সম্পর্ক বর্তমান ; এবং তাঁর স্ত্রীরা তোমাদের (মুসলমান) কাছে মাতৃবৎ।'

মহাত্মা মুহম্মদের বিবাহ

বহু নবীন মুসলমান তাদের ইসলামে শরণ পাওয়ার জন্য মহাত্মার কাছে কৃতজ্ঞ ছিল। যে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'তারা তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ কারণ তারা মুসলমান হয়েছে। তুমি তাদের বলো, আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ো না, কৃতজ্ঞ হও সেই এক ঈশ্বরের প্রতি, যিনি তোমাদের প্রতি উপকার করেছেন, তোমাদের সত্য পথ দেখিয়েছেন।'

(৪৯ : ২ : ৭)

মহাত্মার প্রথম বিবাহ হয় বিবি খাদিজার সঙ্গে যখন তাঁর বয়স পঁচিশ বছর। বিবাহের পর বিবি খাদিজা আরও পঁচিশ বছর জীবিত ছিলেন। মদীনা প্রবাসের দুই বছর আগে যখন মহাত্মা মুহম্মদের আয়ু পঞ্চাশ বছর তখন তাঁর দেহাবসান হয়। ইসলামের শিক্ষাকে সর্বপ্রথম যিনি স্বীকার করেছিলেন, তিনি বিবি খাদিজা। নানাবিধ কারণে বাধ্য হয়ে নবী মুহম্মদকে আরও দশটি বিবাহ করতে হয় এবং এই সমস্ত বিবাহই অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর তিপ্পান্ন বছর বয়সের পর। তখন মহাত্মার কাছে জৈদ নামে এক দাস ছিল। জৈদ ইসলাম ধর্ম স্বীকার করার পর মহাত্মা মুহম্মদ তাকে কেবল দাসত্ব থেকেই মুক্ত করেননি, তাকে তিনি পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁর পিসি উমৈয়ার কন্যা জয়নাবের সঙ্গে জৈদের বিবাহ দেন। জয়নাবের অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং উচ্চবংশের অভিমান ছিল যার জন্য সদ্য দাসত্বমুক্ত জৈদের সঙ্গে তার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না। প্রায় সবসময়েই দু'জনের মধ্যে ঝগড়া হতো। জৈদ অনেকবার সম্পর্ক ছিন্ন (তালাক) করতে চেয়েছিল কিন্তু প্রতিবারই মহাত্মা মুহম্মদ 'নিজের স্ত্রীকে নিজের

কাছেই রাখো এবং ঈশ্বরকে ভয় করো'—বলে তাকে নিবৃত্ত করতেন। যদিও বার বার পরীক্ষা করে তিনি নিশ্চিত হয়েছিলেন যে উভয়ের মধ্যে মনের মিল হওয়া অত্যন্ত কঠিন কিন্তু তালাক-পরবর্তী সমস্যার কথা ভেবেই তিনি জৈদকে নিষেধ করতেন। জয়নাব এবং তার ভ্রাতা মুসলমান হয়ে যাবার ফলে কুরেশীয়দের কোপভাজন হয়েছিল এবং তারাও তাদের ঘর বাড়ি ছেড়ে মদীনায় বসবাস আরম্ভ করেছিল। তালাক হয়ে গেলে জয়নাবের পুনর্বিবাহ হওয়া কঠিন ছিল। মুসলমান হয়ে যাওয়ার ফলে মুসলমান ভিন্ন আর কারও সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া চলে না, আবার মুসলমানদের মধ্যেও কুরেশ বংশের খ্যাতির কারণে তাকে কোনো অকুরেশীয় মুসলমান বিবাহ করতে গররাজী হতে পারে। যদিও এই ঘটনার অনেক আগেই প্রত্যাদেশ এসে গিয়েছিল—

'ঈশ্বর তোমার পোষ্যপুত্রকে তোমার পুত্র করেননি। এগুলি তোমার কপোলকল্পনা মাত্র।' (৩৩ : ১ : ৪)

অতএব জয়নাবের পূর্ব-বিবাহ সম্বন্ধ রহিত (তালাক) হয়ে গেলে ইসলাম ধর্মানুসারে তাকে বিবাহ করতে মহাত্মা মুহম্মদের কোনো বাধাই ছিল না, কিন্তু তিনি লোকাপবাদকে ভয় পেতেন। লোকে বলবে মুহম্মদ তার পুত্রবধূকে বিবাহ করেছে, কিন্তু ইসলাম প্রবর্তকের এ হেন দুর্বলতা যথেষ্ট ক্ষতিকর হতো, যদি তিনি লোকনিন্দার ভয়ে সেই শিক্ষাকে ত্যাগ করতেন, যা তিনি নিজে প্রচার করেছেন। তিনি দ্বিধাগ্রস্ত হলে তাঁর অনুগামীরা তো হতেই পারে। সেজন্যই কোরাণে আদেশ দেওয়া হয়েছে—

মহাত্মা মুহম্মদের স্ত্রীরা

'ঈশ্বরকে ভয় করো এবং যা কিছু তুমি নিজের মধ্যে গোপন রাখতে চাও ঈশ্বর তাকে প্রকাশ করে দেন। তুমি মানুষকে ভয় পাও, কিন্তু ঈশ্বরকে ভয় করাটাই সর্বোত্তম। যখন জৈদ জয়নাবের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করল তখন আমি (ঈশ্বর) তাকে (জয়নাব) তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম। সেটা এজন্য যে এরপর যেন মুসলমানদের তাদের মৌখিক (পোষ্য) পুত্রদের স্ত্রীদের বিবাহ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর পুনর্বিবাহ করতে কোনো দ্বিধা না থাকে।' (৩৩ : ৫ : ৪)

মদীনা প্রবাসের আগে মহাত্মা মুহম্মদের একটিই বিবাহ হয়েছিল, বিবি খাদিজার সঙ্গে। প্রবাসের তিন বছর আগেই তাঁর দেহান্ত হয়। অবশিষ্ট বিবাহ, যা মদীনা আসার পর এবং মহাত্মার তিপ্পান্ন বছর বয়স অতিক্রান্ত হলে হয়েছিল সেগুলির মোট সংখ্যা নয়ের বেশী বলা হয়ে থাকে। প্রধান স্ত্রীগণের নাম—

(১) আয়েশা, দ্বিতীয় খলিফা আবুবকরের কন্যা। (২) হফসা, তৃতীয় খলিফা ওমরের কন্যা। (৩) সৌদা, (৪) উম্ম সলমা (৫) জয়নাব (৬) উম্ম হবীবা, (৭) জবেরিয়া, (৮) মৈমূনা, (৯) সফিয়া।

এদের মধ্যে প্রথম ছয়জন ছিলেন কুরেশবংশীয়। আত্মরক্ষার জন্য সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় মুসলমানেরা বাধ্য হয়ে তরবারির আশ্রয় নেয়। তাদের ইসলামের শত্রু কুরেশ এবং অন্যায় কর্মের সঙ্গী ইহুদীদের সঙ্গে অনেক লড়াই করতে হয়। সেই সব লড়াইয়ে অনেক মুসলমান শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিল। তাদের স্ত্রীরা অকালে বিধবা হয়েছিল। তখন মুসলমানেরা সংখ্যায় অল্প ছিল। তার মধ্য থেকেই সমস্ত অনাথাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থাদি করতে হতো। একটি ছোট ধর্মীয় গোষ্ঠীর পারস্পরিক সম্পর্ককে জোরদার করার জন্য, যুদ্ধে হত শহীদদের বিধবা ও তাদের নিকট আত্মীয় পরিজনদের সন্তুষ্ট করার জন্য বাধ্য হয়েই মহাত্মা মুহম্মদকে আরও কয়েকটি বিবাহ করতে হয়। এরকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েই মহাত্মাকে খুনেসের বিধবা হফসা, আবদুল্লার বিধবা জায়নাব এবং আবুসল্মার বিধবা উম্ম সল্মাকে বিবাহ করতে হয়। ওবেদুল্লার বিধবা উম্ম হবীবাকেও উপরোক্ত কারণেই বিবাহ করতে হয়। যে তিনটি বিবাহ কুরেশ বংশীয় ছাড়া ভিন্ন বংশে হয়েছিল সেটাও জঙ্গী সর্দারদের পরিবারের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করে তাদের আনুগত্য অর্জনের জন্য। আবুবকরের ঐকান্তিক আগ্রহে মহাত্মা আয়েশাকে বিবাহ করেন। উপরোক্ত ঘটনা সমূহ এটাই প্রমাণ করে যে মহাত্মা মুহম্মদ বিষয় ভোগের জন্য বহু বিবাহ করেননি, বরং নব দীক্ষিত ইসলামী সমাজের স্বার্থে সদিচ্ছা প্রণোদিত হয়ে করেছিলেন। রসুল মুহম্মদের বিবাহ সম্বন্ধে কোরাণে নিম্নবর্ণিত আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

নবীর বিবাহযোগ্যা স্ত্রী

'হে নবী! যে স্ত্রীদের তুমি দেনমোহর দান করেছ, (এই ধন বিবাহকালে পুরুষেরা স্ত্রীদের দেবার জন্য স্বীকৃত হয় এবং পুরুষের অপরাধের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটলে স্ত্রীকে তা দিতে হয়) যে তোমার ডান হাতের সম্পত্তি, (যুদ্ধে বিজিত স্ত্রী, যাদের দাসী বানানো হয়েছে), তোমার পিতার ভ্রাতুষ্পুত্রী, পিসি, মামা এবং মাসীর কন্যাগণ, যারা তোমার সঙ্গে প্রবাসে এসেছে, কিংবা এমন কোনো স্ত্রী যে নবীর জন্য নিজেকে অর্পণ করেছে এবং তুমিও যদি তাঁকে বিবাহ করতে আগ্রহী হও, এমন সমস্ত স্ত্রীলোক তোমার বিবাহের জন্য বৈধ।' (৩৩ : ৬ : ৯)

মহাত্মা মুহম্মদের অনাড়ম্বর জীবন যাপন

মহাত্মা মুহম্মদের জীবন কত ভোগবিলাস রহিত অনাড়ম্বড় ছিল তার পরিচয় আমরা নিম্নের বাক্য থেকে পেতে পারি। যেখানে বলা হয়েছে—

'হে নবী! তোমার স্ত্রীদের বলো—তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাসিতা কামনা করো তাহলে তোমাদের কিছু দিয়ে সৌজন্যের সঙ্গে তোমাদের বিদায় জানাতে চাই। আর যদি তোমরা মহান্ ঈশ্বর, তাঁর রসুল (নবী) এবং

অন্তিম নির্ণায়ক দিনের (কেয়ামত) কামনা করো। তাহলে নিশ্চিত জেনো ঈশ্বর এই রকম সদাচারিণী রমণীদের জন্য উত্তম ফল নির্দিষ্ট করে রেখেছেন।'

(৩৩ : ৪ : ১, ২)

যখন কোনো একটি বা একাধিক যুদ্ধে জয়লাভের ফলে লুণ্ঠিত ধন সম্পদের দ্বারা মুসলমানেরা সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল, তাদের অধিকাংশের বাড়ি সুখসম্পদে পরিপূর্ণ ছিল, তাদের পরিবারের রমণীরা অঙ্গবস্ত্রে সুন্দর সুসজ্জিত থাকত, তাদের গৃহকর্মের জন্য যুদ্ধবন্দী দাসদাসী মজুত ছিল সেই অবস্থায় সুখী প্রতিবেশীনীদের দেখে নবীর স্ত্রীদের মধ্যেও সুখ ও বৈভবের আগ্রহ জাগা স্বাভাবিক ছিল। উপরোক্ত কোরাণ-বাক্য সেই দিকে ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে। অন্যের তুলনায় নবীর স্ত্রীদের শুধু ভোগসুখ থেকে বঞ্চিত করাই হয়নি উপরন্তু ওরকম স্পৃহাকে অপরাধ বলা হয়েছে।

নবীপত্নীদের দায়িত্ব

'হে নবীর পত্নীগণ! তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অপরাধ করে। দ্বিগুণ দণ্ড তার প্রাপ্য হবে।' (৩৩ : ৪ : ৩)

প্রকৃতপক্ষে আপন অনুগামীদের কাছে আদর্শরূপে প্রতিভাত হওয়ার জন্য নবী মুহম্মদ ও তাঁর স্ত্রীদের অনুরূপ হওয়ার প্রয়োজন ছিল।

'হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্যান্য সাধারণ স্ত্রীদের মতো নও।'

(৩৩ : ৪ : ৪)

উপরোক্ত বাক্যের মধ্য দিয়েই নবীপত্নীদের প্রকৃত অবস্থান বর্ণনা করা হয়েছে।

স্ত্রীদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব

তখনকার দিনে আরবের অধিবাসীদের মধ্যে রমণীদের অত্যন্ত তুচ্ছ জ্ঞান করা হতো। রমণীরা ছিল পুরুষের কাছে বিলাস সামগ্রী এবং গৃহকর্ম করার যন্ত্র বিশেষ। পুরুষের কোনো কথার উত্তর দেবারও অধিকার তাদের ছিল না। কিন্তু হজরত মুহম্মদ তাঁর স্ত্রীদের অনেক পরিমাণে স্বাতন্ত্র্যতা দিয়েছিলেন। কথিত আছে একসময় ওমরের পত্নী তাঁর স্বামীকে কিছু পরামর্শ দেন। আরবী প্রথানুসারে ওমর উত্তর দেন যে 'এ সমস্ত বিষয়ের সঙ্গে তোমার কোনো সম্বন্ধ নেই অতএব পরামর্শ দেওয়া অনধিকার চর্চা।' প্রত্যুত্তরে ওমর পত্নী বললেন, 'তোমার কন্যা হফসা (নবীর স্ত্রী) তাহলে কেন হজরতের সঙ্গে উত্তর প্রতি উত্তর করে, এমনকি সময় সময় তিনি অপ্রসন্নও হন কিন্তু কিছু বলেন না, আর এখানে তুমি চাও যে আমি কোনো বিষয়েই কোনো পরামর্শ না দিই।' এ সব শুনে ওমরের স্বীয় কন্যা হফসার ওপরে অত্যন্ত ক্রোধ হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ গিয়ে কন্যা

হফসাকে ওরকম করতে নিষেধ করলেন। এরপর যখন এই একই নিষেধ তিনি নবীর আরেক স্ত্রী উম্ম সলমাকে জানালেন, তখন উম্ম সলমা রুক্ষস্বরে উত্তর দেন—'নবীর স্ত্রীদের কথার মধ্যে দখল দেবার কোনো অধিকার তোমার নেই।'

আয়েশা এবং হফসার নবীর সঙ্গে কলহ

মহাত্মা মুহম্মদের পত্নীরা সত্যসত্যই অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় প্রচুর স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তিনি তাদের কথারও যথেষ্ট খেয়াল রাখতেন। একবার হজরত নবী পালা না থাকা সত্ত্বেও জয়নাবের ঘরে গিয়ে মধু খেয়েছিলেন। এটা তাঁর অন্য দুই পত্নী আয়েশা এবং হফসার সহ্য হয়নি। তারা হজরতকে বিব্রত করার জন্য বলতে থাকেন 'মধুর গন্ধ আসছে।' বারম্বার এ ধরনের মন্তব্য শুনে হজরত নবী শপথ নিয়ে চিরকালের জন্য মধু পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এজন্য যাতে সমস্ত মুসলমানেরা মধুকে নিষিদ্ধ মনে না করে তার জন্য আদেশ হলো—

'হে নবী! যা তোমার জন্য বিহিত, কেন তাকে নিষিদ্ধ করছ? তুমি কি তোমাদের পত্নীদের প্রসন্নতা কামনা করছ? ঈশ্বর দয়ালু এবং ক্ষমাশীল। তোমাব আপন শপথ ভঙ্গ করাই তোমার কর্তব্য বলে ঈশ্বর মনে করেন।' (৬৬ : ১ : ১, ২)

বহুবিবাহের কুপ্রভাব এবং সপত্নী কলহ এমনিতেই প্রসিদ্ধ। এক স্ত্রীব সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা বললেই আরেক জনের ঈর্ষা হতে থাকে। একবার তো আয়েশা এবং হফসা এমন বিবাদ শুরু করেন যে স্বয়ং পবিত্র কোরাণে এ বিষযে বাণী অবতীর্ণ হয়।

'যদি তোমরা দুজনে ঈশ্বরের কাছে অনুতপ্ত হও, তাহলে তোমাদের হৃদয় বিনম্র হবে। কিন্তু যদি তোমরা উভয়ে তাঁর (মুহম্মদ) ওপরে চড়াও হও, তবে নিশ্চই ঈশ্বর, জিব্রাইল (দেবদূতদের মধ্যে প্রমুখ) সদাচারী মুসলমান এবং ফেরেস্তারা তাঁর সহায়ক, তাঁর পিঠের ওপরে আছে। যদি এই মুহূর্তে নবী তোমাদের সকলকে পরিত্যাগ করেন তাহলে তোমাদের পরিবর্তে ঈশ্বর তাঁকে আরও উত্তম পত্নী দেবেন, যারা হবে, আত্মসমর্পণকারী, বিশ্বাসী, অনুতাপকারী, সেবিকা, রোজা (উপবাস) পালনকারী এবং কুমারী।' (৬৬ : ১ : ৩-৪)

বিনা আমন্ত্রণে ঘরে যাওয়া নিষিদ্ধ

'নবীর স্ত্রীরা তোমাদের মায়ের মতো' পবিত্র কোরাণে বিশ্বাসীদের প্রতি এই বাণী আগেই লেখা হয়েছে। কোরাণের ঐশী বাণীই বিধবা স্ত্রীদের সঙ্গে মুসলমানদের বিবাহ হওয়াকে উপযুক্ত বলে নির্দেশ করে।

তখনকার আরবীয়দের ব্যক্তিগত জীবনে বিভিন্ন ধরনের দুরাচার দেখে মুসলমানদের আচরণ যাতে সঠিক হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। আপন আচরণের মাধ্যমে ইসলামের মহত্বকে প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মুসলমানের

পবিত্র কর্তব্য ছিল। তাদের অন্য কোনো স্ত্রীলোকের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা একেবারেই নিষিদ্ধ ছিল। এমনকি বিনা প্রয়োজনে তাদের নবীর গৃহে যাতায়াতের ওপরেও নিষেধাজ্ঞা আরোপিত ছিল। বলা হয়েছে—

'আহারের জন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না আহ্বান আসে, ততক্ষণ নবীর গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করো না। আর আহার ক্রিয়া সমাপ্ত হলে তোমরা চলে যাও। সেইখানে বসে নিজেদের মধ্যে খোস গল্পে মেতে উঠো না। কারণ তোমাদের এ ধরনের ব্যবহার নবীর মনে ক্লেশ উৎপন্ন করে, কিন্তু সংকোচবশত তিনি তোমাদের কিছু বলতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সংকোচের বস্তু কিছুই নেই তিনি সত্য বলতে দ্বিধান্বিত নন।' (৩৩ : ৭ : ১)

এই বিন্দুতে সংক্ষেপে আমরা সেই সমস্ত বিষয়কে কেন্দ্রীভূত করার চেষ্টা করেছি যেগুলির সম্বন্ধ বিশেষভাবে হজরত মুহম্মদের সঙ্গে বর্তমান ছিল। এখানে এই বিষয়ে আরেকটি বক্তব্যের প্রতি সুনির্দিষ্ট মনোনিবেশ করা প্রয়োজন, তা হলো যুদ্ধে লুন্ঠিত সম্পত্তির বিভাগ। এ ধরনের সম্পত্তির এক পঞ্চমাংশ নবীর নিকটে যেত এবং তা ব্যয়িত হতো ঈশ্বর, নবীর আত্মীয় পরিজন, দরিদ্র-অনাথ এবং পথিকদের জন্য। (৮ : ৫ : ৪)

পঞ্চম বিন্দু

প্রাচীন কাহিনী

'এই সেই জনপদ, যার বৃত্তান্ত তোমাকে আমি শোনাচ্ছি।' (৭ : ১৩ : ৬)

'হে মুহম্মদ তুমি তাদের কাছে কাহিনী বর্ণনা করো, হয়তো তারা বিচার করবে।' (৭ : ২২ : ৫)

উপরে যেমনভাবে বর্ণিত হয়েছে সেই ভাব অনুসরণ করলে দেখা যায় যে পবিত্র কোরাণের বিশেষ একটি ভাগ অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ ইতিবৃত্ত এবং কাহিনীর দ্বারা পূর্ণ। উপরোক্ত বাক্য তারই সাক্ষ্য বহন করে। কোরাণে বর্ণিত সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে একটি সাধারণ আলোচনা করাই এই কোরাণসার রচনার উদ্দেশ্য। অতঃপর আমরা এখানে সেই সমস্ত কাহিনীর কিছু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব। এই কাহিনী সমূহের মধ্য থেকে বেশ কিছু কাহিনী বাইবেলেও বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আদম

১) মহাত্মা আদম—'যখন ঈশ্বর ফেরেস্তাদের বললেন, আমি পৃথিবীতে এক সহায়ক সৃষ্টি করতে ইচ্ছুক। তারা বলল তুমি সেখানে এমন সৃষ্টি করবে যারা কেবল রক্তপাত ও কলহ করবে? আমরা তো সর্বদাই তোমার স্তুতি করে থাকি। ঈশ্বর আদমকে সম্পূর্ণ নাম (জ্ঞান) শিক্ষা দিলেন, তারপর তাঁকে ফেরেস্তাগণের সম্মুখে উপস্থিত করলেন এবং বললেন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে এই সমস্ত বস্তুর নাম আমাকে বলো। তারা বলল, তুমি পরম পবিত্র, কিন্তু তুমি যা আমাদের শিখিয়েছ তার অতিরিক্ত কোনো জ্ঞানই আমাদের নেই। তখন প্রভু বললেন, হে আদম! তুমি এদের নাম বলে দাও। অতঃপর যখন আদম তাদের সকলের নাম বলে দিলো, তখন ঈশ্বর বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত বিষয়ই আমার জ্ঞাত কিন্তু তোমাদের অজানা। এরপর ঈশ্বর ফেরেস্তাদের বললেন, তোমরা আদমের প্রতি প্রণত হও। কিন্তু ফেরেস্তাদের প্রধান ইব্‌লিস ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করল। (২ : ৪ : ১-৫) ইব্‌লিস বলল, আমি আদমের থেকে শ্রেষ্ঠ, আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর সে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্ট। (৩৮ : ৫ : ১৪) অতঃপর ইব্‌লিস ঈশ্বরের পথ রুদ্ধ করে সকলকে পথভ্রষ্ট করার হুমকি দেয়। প্রভু তার ঔদ্ধত্যে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন এই শয়তান ইব্‌লিসকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার করা হবে এবং তার কথা যারা শুনবে তারা নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। (৭ : ২ : ৩-৫) এরপর ঈশ্বর আদম এবং তাঁর স্ত্রীকে স্বর্গের উদ্যানে বাস করার আজ্ঞা দিলেন, এবং বললেন,

যা ইচ্ছা ভক্ষণ করো কিন্তু এই বিশেষ বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না। (২ : ৪ : ৬) এরপর শয়তান ইব্‌লিস আদমের স্ত্রীকে প্রলোভিত করল। সে বলল, তোমরা যাতে অমরত্ব অর্জন না করো অথবা ফেরেস্তা না হয়ে যাও সে জন্য ঈশ্বর এই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করতে তোমাদের নিষেধ করেছেন। (৭ : ২ : ৯) সে আরও কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, আমি তোমাদের বলে দেবো অমর বৃক্ষ এবং অক্ষয় রাজ্যের কথা। (২০ : ৭ : ৫) ফল ভক্ষণের পরেই তাদের অবগুণ প্রকাশিত হলো এবং তারা পাতার সাহয্যে তাদের শরীরের অংশ বিশেষকে ঢাকতে গেলো। তখন ঈশ্বর বললেন, আমি কি তোমাদের বলিনি যে শয়তান তোমাদের শত্রু। এখন তোমরা স্বর্গ থেকে নেমে যাও। (৭ : ২ : ৯, ১১-১৩) এইভাবে শয়তান ওই দুজনকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত করায়। (২ : ৪ : ৭) তার উদ্দেশ্য পূরণ হওয়ার পর শয়তান বলল, ঈশ্বর সঠিক বলেছিলেন, আমার কথা মিথ্যা ছিল। তোমরা আমার অধীন ছিলে না, তা সত্ত্বেও আমি যা বললাম তা তোমরা মেনে নিলে। এরপর আমাকে অপরাধী করো না। নিজেদেরকেই দোষ দাও।' (১৪ : ৪ : ১)

নূহ

২) মহাত্মা নূহ—'ঈশ্বর তাঁকে তার জাতির কাছে পাঠালেন, বললেন, তাদের ওপব যন্ত্রণা উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই তাদের সতর্ক করো। নূহ বলল, হে আমার জাতিগণ, আমি সতর্ককারী। ঈশ্বরের আরাধনা করো, তাঁকে ভয় করো, আমার কথা শোনো। তাঁর চেষ্টা নিষ্ফল দেখে নূহ বললেন, হে প্রভু! আমি দিনরাত আমার জাতিকে আহ্বান করছি কিন্তু তাদের পলায়ন প্রবণতার বৃদ্ধি ছাড়া আর কোনো ফল হচ্ছে না। (৭১ : ১ : ১৩) তারা বলছে, তাদের আরাধ্য—বদ্দ, সুবাঅ, য়গুস, য়উক এবং নস্‌কে ত্যাগ করো না। নূহ বললেন, হে প্রভু! নাস্তিকদের একজনও যেন পৃথিবীতে না থাকে, তাহলে তারা তোমার ভক্তদের পথভ্রষ্ট করবে। (৭১ : ২ : ৬,৭) নূহ তার জ্ঞাতিদের মধ্যে নয়শত পঞ্চাশ বছর জীবিত ছিলেন।' (২৯ : ২ : ১) ইহুদী এবং খৃস্টীয়দের পবিত্র গ্রন্থ বাইবেলের উৎপত্তি (Genesis) পর্যায়েও (৭ : ১ : ২৮) এই বর্ণনাই পাওয়া যায়।

নূহর বিষয়ে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে—'নূহকে ঈশ্বর তাঁর জাতির কাছে পাঠালেন। জাতির লোকেরা বলল, আমরা তোমাকে ভ্রান্তির মধ্যে দেখছি। নূহ বললেন, আমি ভ্রান্ত নই, আমি ঈশ্বর প্রেরিত। কিন্তু তার জাতির লোকেরা তাঁকে অবিশ্বাস করল। তারপর আমি (ঈশ্বর) তাঁকে (নূহকে) এবং তাঁর বিশ্বাসী সঙ্গীদের নৌকায় তুলে রক্ষা করি এবং যারা অবিশ্বাসী ছিল তাদের নিমজ্জিত করি।' (৭ : ৮ : ১-৩,৬)

ইব্রাহীম

৩) মহাত্মা ইব্রাহীম—'যখন বালক ইব্রাহীম তাঁর পিতা আজরকে বলেছিলেন, তোমরা মূর্তিকে ঈশ্বর মেনে নিয়ে পূজা করো। আমি তো দেখছি তোমাদের সমস্ত জাতিই মহাভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে। তখন তাঁকে প্রলোভিত করার জন্য (শয়তান) ভূমি ও আকাশের রাজ্য দেখাল। অন্ধকার রাত্রিতে আকাশে তারা দেখে ইব্রাহিম বললেন, ওই আমার ঈশ্বর। অতঃপর তারা অস্তমিত হলে পরে তিনি বললেন, যা অস্ত যায় তা আমার পছন্দ নয়। এরপর আকাশে চন্দ্রমার উদয় হলে পরে তাকেও ইব্রাহীম ঈশ্বর মনে করলেন এবং দিনের আলোতে চন্দ্রমা অদৃশ্য হওয়ায় ইব্রাহীম বললেন, আমার প্রতিপালক প্রভু আমাকে সত্য পথ না দেখালে আমি তো পথভ্রষ্ট হব। তারপর সূর্যকে উদিত হতে দেখে বললেন, এ আমার প্রতিপালক। ইহা সকলের চেয়ে বড়। কিন্তু সেও যখন অস্ত গেলো, তখন ইব্রাহীম বললেন, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তার দিকে অত্যন্ত একনিষ্ঠতার সঙ্গে মুখ ফেরালাম, যিনি আশমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা। (৬ : ৯ : ৫-১০) এরপর ইব্রাহীম তাঁর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কিসের পূজা করো? মন্দিরে প্রবেশ করে মূর্তিদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলেন, তোমরা আহার করো না কেন? তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা কথা বলো না। তারপর তিনি তাঁর ডানহাতে মূর্তি ভাঙতে লাগলেন। সকলে দিশেহারা হয়ে দৌড়ে এল। ইব্রাহীম তাদের বললেন, আপন হাতে যাদের তৈরি করেছ, কেন তাদের পূজা করো। এদের সকলকে আগুনে নিক্ষেপ করো, ইব্রাহীমের এ হেন আচরণ দেখে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা নানা চক্রান্ত করতে চেষ্টা করে কিন্তু আমি (ঈশ্বর) তাদের পরাভূত করি।' (৩৭ : ৩ : ১১, ১৭-২১, ২৩-২৪)

ইব্রাহীমের অতিথিরা ভিতরে এসে তাকে সালাম জানাল। অতঃপর ইব্রাহীম গৃহাভ্যন্তর থেকে এক মাংসল ভাজা গোবৎস নিয়ে এলেন! জিজ্ঞেস করলেন তোমরা ভক্ষণ করছ না কেন? ইব্রাহীমকে ভীত দেখে তারা বলল, ভীত হয়ো না। আমরা তোমাকে এক জ্ঞানী পুত্রের জন্মের শুভ সমাচার দিতে এসেছি। একথা শুনে তাঁর স্ত্রী মাথা চাপড়ে বললেন, আমি এক বৃদ্ধা এবং আমার স্বামীও বৃদ্ধ। (৫১ : ২ : ১-৬)

'তারা বলল শক্তিমান জ্ঞানী মহাপ্রভু এরকমই বলেছেন।' (১১ : ৭ : ৪)

'আমি (ঈশ্বর) তাঁকে (ইব্রাহীমকে) ইস্‌হাক এবং ইসমাইল নামের দুটি সন্তান দান করেছি।' (২৯ : ৩ : ৫)

'স্বপ্নে ঈশ্বরের নামে তাঁর আপন পুত্রকে বলিদান (কোরবানি) দেওয়ার ইচ্ছা হল। পুত্র পিতার ইচ্ছার কথা শুনে বলল, আমি ঈশ্বরের ইচ্ছায় ধৈর্যশীল হব। যখন ইব্রাহীম কোরবানির জন্য পুত্রকে ভূমিতে শোয়ালেন, তখন ঈশ্বর বললেন— তুমি তোমার স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছ। এখন তুমি তোমার পুত্রের

পরিবর্তে কোনো বড় পশুকে কোরবানি করো।' (৩৭ : ৩ : ২৩, ৩৩)

'যখন ইব্রাহীম প্রশ্ন করলেন—হে প্রভু! তুমি কিভাবে মৃতদের পুনরুজ্জীবিত করবে? ঈশ্বর উত্তরে বললেন, পক্ষীকুলের মধ্য থেকে চারটিকে গ্রহণ করো এবং সম্মিলিত খণ্ড থেকে চার খণ্ড চারটি পর্বত শীর্ষে রেখে দাও! তারপর তাদের আহ্বান করো, তারা তোমার কাছে ছুটে আসবে। ঈশ্বর সর্বশক্তিমান।' (২ : ৩৫ : ৩)

লূতের কথা

(৪) মহাত্মা লূত—'ঈশ্বরের দূত যখন লূতের নিকটে গেলো, তখন সে ভীত হলো। তাঁর অস্বাভাবিক ব্যভিচারে অভ্যস্ত জাতির লোকেরা তাঁর কাছে দৌড়ে এল। লূত তাদের বলল, হে ভাই? আমার এই করস্পর্শ-রহিত কন্যারা আছে, এদের দ্বারা তোমাদেব ইচ্ছা পূরণ করো। ঈশ্বরকে ভয় করো আর আমাকে আমার অতিথিদের সামনে হেয় করো না। তারা বলল, আমরা কি চাই তা তুমি ভালো করেই জানো, তোমার কন্যাদের সম্পর্কে আমাদের কোনো আগ্রহ নেই। লূতের অতিথিরা তাঁকে ভয়ভীত দেখে বলল, আমরা ঈশ্বরের দূত, তুমি ভয় পেয়ো না। আজ রাত্রিতেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়, এবং পিছনে আর ফিরে দেখো না। তোমার স্ত্রী দুর্ভাগ্যবশত পিছনে ফিরে তাকাবে এবং সকলের প্রতি যা ঘটবে তোমার স্ত্রীর প্রতিও অনুরূপ ঘটবে। পরদিন ঈশ্বরের কোপে সমস্ত জনপদ ওলট পালট হয়ে গেলো এবং তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষিত হলো।'

(১১ : ৭ : ১০-১৪)

অন্য এক জায়গাতে এই বর্ণনাই একটু রকমফের হয়ে এভাবে এসেছে—

'লূত তাঁর জাতিকে বললেন,—তোমরা এমন নির্লজ্জ এবং কদর্য আচার আচরণ করছ যা তোমাদের আগে কেউ কখনও করেনি। তোমরা কাম-লালসার তাড়নায় স্ত্রীলোকদের বদলে পুরুষের ওপরে উপগত হতে চাইছ। তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা বলল, একে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও। ও নিজেকে বড় বেশী পুণ্যাত্মা বলে মনে করে। অতঃপর ঈশ্বর তাঁকে এবং তাঁর এক স্ত্রী ব্যতিরেকে সকল পরিজনকে উদ্ধার করেন। বাকী সকলের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ধ্বংসপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়।' (২৭ : ৪ : ৮-১১)

আরেক জায়গায় লূতের উপদেশ নিম্নে বর্ণিত শব্দে দেওয়া হয়েছে—

'ওদের ভাই লূত বলল, আমি তোমাদের জন্য সকলের বিশ্বাসের পাত্র ঈশ্বর প্রেরিত, অতএব আমার কথা শোনো এবং তাঁকে ভয় করো। ঈশ্বর তোমাদের জন্য যাদের সৃষ্টি করেছেন, সেই রমণীগণকে ছেড়ে তোমরা পুরুষের দিকে লালসা তাড়িত হয়ে ধাবিত হও। তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের দলভুক্ত।'

(২৬ : ৯ : ৩,৭)

ইউসুফের কথা

(৫) ইউসুফ—'বালক ইউসুফ তার পিতা ইয়াকুবকে বলল, আমি স্বপ্নে একাদশটি নক্ষত্র এবং চন্দ্র ও সূর্যকে প্রত্যক্ষ করেছি এবং তাদের আমার প্রতি প্রণত হতে দেখেছি। তার পিতা তাকে বললেন, হে ইউসুফ! তোমার এই স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদের বলো না, অন্যথায় তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। এইরূপে তোমার প্রতিপালক তোমাকে মনোনীত করবেন এবং স্বপ্ন রহস্যের ব্যাখ্যা তোমাকে শেখাবেন। এবং তোমার প্রতি, সমস্ত ইয়াকুব বংশের প্রতি তাঁর (ঈশ্বরের) অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করবেন। ঠিক যেরকম তোমার দুই পূর্ব-পুরুষ ইব্রাহীম ও ইসহাকের প্রতি করেছিলেন। (১২ : ১ : ৪-৬) একবার ইউসুফের ভাইয়েরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল যে আমাদের পিতা আমাদের অপেক্ষা ইউসুফ এবং তার ভাইকে (বনি-আমীন) অধিক স্নেহ করেন। অতএব আমরা একদিন ইউসুফকে মেরে কোথাও ফেলে দেবো। তখন তাদের মধ্যে একজন বলল, ওকে মেরে না ফেলে, কোনো গভীর কূপে নিক্ষেপ করা হোক, কোনো পথিক পরে হয়ত তাকে তুলে নিয়ে যাবে। তারা তাদের পিতাকে বলল, আপনি ইউসুফের বিষয়ে কেন আমাদের বিশ্বাস করছেন না? তাকে আমাদের সঙ্গে শিকারে যেতে দিন। অতঃপর ভাইয়েরা তাকে নিয়ে গেলো এবং অরণ্যের মধ্যে এক গভীর কূপে নিক্ষেপ করল। আমি (ঈশ্বর) সঙ্গে সঙ্গে তাকে জানিয়ে দিলাম যে একদিন যখন তোমার ভাইয়েরা তোমাকে চিনতে পারবে না তখন তাদের এই অপরাধের কথা স্মরণ করিয়ে দিও। এরপর ভাইয়েরা ইউসুফের পরিধেয় বস্ত্রকে রক্তের রঙে রঞ্জিত করে পিতার সম্মুখে রেখে বলল, তাকে নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে। তুমি হয়তো আমাদের বিশ্বাস করবে না, যদিও আমরা সত্যবাদী। ওদিকে অরণ্যের মধ্যে কোনো এক যাত্রী-দলের জনৈক যাত্রী জলপানের উদ্দেশ্যে সেই কুপের কাছে যায়, এবং ইউসুফকে উদ্ধার করে। তারপর তাকে এক মিশরীয় সওদাগরের কাছে বিক্রি করে দেয়।'

(১২ : ২ : ২-১৪)

'মিশরীয় বণিক এই সুন্দর বালককে মিশরের এক রাজমন্ত্রীর স্ত্রীর কাছে বিক্রী করে। ইউসুফকে তারা যত্নেই রেখেছিল। অতঃপর ইউসুফ যৌবনে পদার্পণ করলে তাঁর সুন্দর রূপে রাজমন্ত্রীর স্ত্রী মোহিত হলো এবং তাকে একদিন বন্ধ ঘরে ডেকে তার প্রতি উপগত হতে অনুরোধ করল। ইউসুফ তাকে প্রত্যাখ্যান করে বলল, ঈশ্বর সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। মিশরের রাজমন্ত্রী আজীজের স্ত্রী তাঁর আপন ক্রীতদাসের প্রতি অনুরক্ত এই কথা সমগ্র জনপদে ছড়িয়ে পড়ল। তারপর আজীজের পত্নী নগরের অন্যান্য রমণীগণকে ডেকে পাঠাল এবং ইউসুফকে তাদের সামনে হাজির করে তাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে খরমুজ এবং সেটি কাটার জন্য একটি করে ছুরি দিলো। ইউসুফের

রূপে তারা এত মুগ্ধ হয়ে পড়েছিল যে খরমুজ কাটতে গিয়ে হাত কেটে বসল। তারা বলল, ইন্‌সাল্লাহ (হায় ঈশ্বর) এ মানুষ নয় কোনো দেবতা। ইউসুফের কাছ থেকে প্রত্যাখ্যান পেয়ে সেই নারী তাঁকে কারাগারে নিক্ষেপ করার হুমকি দেয়। ইউসুফ উত্তরে বলল, আমাকে যেদিকে আহ্বান করছ তার থেকে কারাগার অনেক শ্রেয়। ইউসুফের কারাবাস হলো। কারাগারে তার সঙ্গে আরও দুজন বন্দী ছিল। এক রাত্রিতে তারা উভয়েই স্বপ্ন দেখল এবং তার কাহিনী ইউসুফকে জানাল। একজন বলল, সে স্বপ্নে নিজেকে আঙুর নিংড়িয়ে রস বের করতে দেখেছে। অপরজন বলল যে সে নিজেকে মাথায় রুটি নিয়ে যেতে দেখেছে এবং সেখানে একটি পাখি তার মাথার ওপর থেকে রুটি খাচ্ছে। ইউসুফকে ঈশ্বর স্বপ্নরহস্যের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন। সে বলল, তোমাদের মধ্যে যে মাথায় রুটি বহন করতে দেখেছে সে বাবুর্চিখানার অধ্যক্ষ হবে এবং পরে তার শূলদণ্ডের শাস্তি হবে এবং পাখিতে তার মাথার ঘিলু ঠুকরে খাবে। দ্বিতীয়জন যে আঙুর নিংড়িয়ে রস বের করতে দেখেছিল তাকে বলল, তুমি রাজাকে সুরাপান করাবে এবং তাঁর প্রিয় দাস হবে। কিন্তু সেই অবস্থায় আমাকে ভুলে যেও না, স্মরণে রেখ। ইউসুফের স্বপ্ন ব্যাখ্যা সঠিক হয় কিন্তু রাজার প্রিয় সেবক হয়ে সেই বন্দী ইউসুফকে ভুলে গেলো। ইউসুফ আরও বহুদিন কারারুদ্ধ রইল।' (১২ : ২-৫)

'এক সময় রাজা স্বপ্নে দেখলেন সাতটি স্থূলকায়া গাভীকে সাতটি শীর্ণকায়া গাভী ভক্ষণ করছে। তাছাড়া আরও দেখলেন, সাতটি সতেজ সবুজ শস্যের শিষ এবং সাতটি শুক্‌নো শিষ। রাজা স্বপ্ন ব্যাখ্যার জন্য প্রধানদের ডাকলেন। তারা বলল, এ বড় জটিল স্বপ্ন আমরা এর ব্যাখ্যায় অপারগ। সেই সময় ইউসুফের সেই সহবন্দী যে ইতিমধ্যে রাজার প্রিয়পাত্র হয়েছে, তার ইউসুফের কথা স্মরণ হলো। সে বলল আমি একজনকে জানি, যে এর উত্তম ব্যাখ্যা করতে সক্ষম, আমাকে তার নিকটে যেতে অনুমতি প্রদান করা হোক। সে ইউসুফের কাছে গিয়ে বলল, হে ইউসুফ! সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভীকে সাতটি রুগ্ন, শীর্ণ গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ ও সাতটি শুষ্ক শিষের কি রহস্য তুমি আমাকে জানাও। ইউসুফ বলল, তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে। উৎপন্ন শস্যের যৎসামান্য ভোগ করবে আর বেশী পরিমাণ শস্য শিষ সহ রেখে দেবে। তার পরবর্তী সাত বছর দারুণ খরা হবে, আকাশ থেকে এক বিন্দু জলও বর্ষিত হবে না। সেই আপৎকালে তোমরা এই সাত বছরের সঞ্চিত শস্য ভক্ষণ করবে এবং সামান্য কিছু রেখে দেবে। তার পরবর্তী বছরে আবার প্রচুর বারি বর্ষণ হবে এবং মানুষ ভোগে সুখে বাস করবে। স্বপ্ন ব্যাখ্যা শুনে রাজা ইউসুফের জ্ঞানের পরিচয় পেলেন এবং ইউসুফকে কারামুক্ত করে নিয়ে আসার আদেশ দিলেন। রাজা ইতিমধ্যে সেই সমস্ত রমণীদের কাছ থেকে তাঁর

নির্দোষিতার প্রমাণও পেয়েছিলেন। তিনি তাঁকে আপন সহচর নিয়োগ করতে চাইলেন। ইউসুফ বললেন আমাকে রাজ্যের কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করুণ, আমি বিশ্বস্ত এবং অভিজ্ঞ। দুর্ভিক্ষের সময় শস্য ইত্যাদি বিতরণের ভারও তার ওপরে ন্যস্ত ছিল। একদা দুর্ভিক্ষ পীড়িত হয়ে ইউসুফের ভাইয়েরা তার কাছে এল, যদিও ইউসুফ তার ভাইদের চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু তারা ইউসুফকে চিনতে পারেনি। খাদ্যশস্যের থলি প্রস্তুত হলে, ইউসুফ তাদের বলল, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাই বনি-আমীনকে নিয়ে আসছ ততক্ষণ পর্যন্ত এই রসদ নিয়ে যেতে পারবে না। তার ভাইয়েরা বলল, এ বিষয়ে আমরা আমাদের পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব। অতঃপর তারা তাদের পিতাকে বলল, হে পিতা বনি-আমীন আমাদের সঙ্গে না গেলে আমরা পণ্যমূল্য দিয়েও রসদ পাব না। অতএব তাকে আমাদের সঙ্গে যেতে দিন। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। তাদের পিতা বললেন, আমি কি তোমাদের এই ভ্রাতা সম্বন্ধে সেরকম বিশ্বাসই করব যা তোমাদের ভাই ইউসুফ সম্পর্কে করেছিলাম? ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ বক্ষক এবং পরম দয়ালু। তারপর তারা তাদের রসদের থলের মধ্যে তাদের পণ্যমূল্য ফেরৎ পেল। ইউসুফের ইচ্ছা ছিল ভাই বনি-আমীনকে তার কাছে রাখবে। কিন্তু মিশরীয় আইনানুসারে তা সম্ভবপর ছিল না। ইউসুফের ভ্রাতারা যখন তাদের বৈমাত্রের ভাইকে সঙ্গে নিয়ে ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলো, তখন সে বলল, নিশ্চই আমি তোমাদের ভ্রাতা। অতঃপর সে যখন তাদের রসদের ব্যবস্থা কবল তখন কোনো এক ফাঁকে তার ভাই বনি-আমীনের থলেতে লুকিয়ে একটি পানপাত্র রেখে দিয়েছিল। এরপর জনৈক রাজকর্মচারী ঘোষণা করে উঠল। হে বণিকদল তোমাদের মধ্যে কেউ একজন তস্কর। তারা বলল, আমাদের মধ্যে যার মালপত্রের মধ্যে ওই পানপাত্র পাওয়া যাবে তার যেন কারাদণ্ড হয়। আমরা এই দেশে রসদ সংগ্রহে এসেছি, অশান্তি করতে নয়। অতঃপর ইউসুফ তার ভাইদের মালপত্র তল্লাস করে কিছু পেল না কিন্তু পানপাত্র পাওয়া গেলো তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই বনি-আমীনের মালপত্রের মধ্যে। ভাইকে নিজের কাছে রাখার জন্য ইউসুফ এই পরিকল্পনা করেছিলেন। ভাইয়েরা তাকে মুক্ত করার অনেক চেষ্টা করে। অবশেষে ইউসুফ তাদের সামনে তার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে তাদের যথেষ্ট লজ্জিত করে তাদের অতীত কাজ কর্মের জন্য। ভাইয়েরা বন্দী ভাইকে ছাড়াবার অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়। পুত্রের বিয়োগে চোখের জল ফেলে ফেলে অন্ধ হয়ে যাওয়া পিতার কাছে ইউসুফ তার একটি জামা পাঠালেন, যার স্পর্শে বৃদ্ধ পিতা দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবে। ইউসুফ আরও বললেন, পিতাকে নিয়ে এসে তোমরা সকলে আমার কাছে বাস করো। তারা যাওয়ার পর ইউসুফ বৃদ্ধ পিতামাতাকে সিংহাসনে বসিয়ে সকল ভাইয়েরা মিলে তাদের প্রণাম জানাল।'

'(১২ : ৬-১১)

(৬) মহাত্মা মূসা—'মিশরের ফারাউন (ফ্যারাও অথবা ফারাউন মিশরের তৎকালীন সম্রাটদের উপাধি) ফিলিস্তিন ভূমি জয় করে সেখানকার অনেক নাগরিককে যুদ্ধে বন্দী করে দাস হিসাবে মিশরে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে সম্রাটের আজ্ঞা হয় যে এই ইস্রাইল সন্তানদের মধ্যে কোনো শিশু পুত্রের জন্ম যেন না হয়। হলে জন্ম মুহূর্তেই তাকে হত্যা করা হবে। কন্যা সন্তান জন্মের বিষয়ে এরকম রাজাজ্ঞা ছিল না। মূসার জন্মের পরই তার মা সন্তান নিহত হবে ভয়ে একটি বাক্সতে ভরে তাকে খালে ভাসিয়ে দেয়। ভাসতে ভাসতে সেই বাক্স ফারাউনের স্ত্রীর কাছে পৌছায়। রানী অত্যন্ত স্নেহে এই শিশুকে লালন পালন করেন। শিশুর নিজের মাকেই রানী তার ধাত্রী রূপে নিযুক্ত করেন। যুবা বয়সে মূসা এক মিশরীয়কে একজন ইহুদীকে মারতে দেখে ক্রোধান্বিত হন এবং সেই মিশরীয়কে হত্যা করেন। অতঃপর মূসা সেখান থেকে মদৈন অঞ্চলে চলে যান। মূসা যখন মদৈন অঞ্চলের একটি কূপের নিকটে পৌছালেন তখন দেখলেন একদল লোক তাদের পালিত পশুপালকে জলপান করাচ্ছে, দুজন রমণী তাদের পশুদের নিয়ে অদূরে দাঁড়ানো। মূসার প্রশ্নের উত্তরে তারা বলল যে যতক্ষণ না ওই সব রাখালেরা কূপ ছেড়ে চলে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পশুদের জলপান করাতে পারছে না। তাদের পিতা অতি বৃদ্ধ তাই তাদেরই এই কাজ করতে হচ্ছে। মূসা তখন তাদের পশুপালকে জলপান করাল। রমণীদের মধ্যে একজন সলজ্জ নয়নে তাকে এসে বলল, তুমি আমাদের পিতার কাছে চল, তিনি তোমাকে পুরস্কৃত করবেন, কারণ তুমি আমাদের পশুপালকে জলপান করিয়ে আমাদের অত্যন্ত উপকার করেছ। তাদের পিতার কাছে যাওয়ার পর একজন বলল, হে পিতা, তুমি একে তোমার মজুর হিসাবে নিযুক্ত করো। তোমার মজুর হিসাবে সেই উত্তম হবে যে শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত। পিতা (হজরত শোয়েব) মূসাকে বললেন, আমি আমার দুই কন্যার একজনের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে চাই তবে তাতে একটা শর্ত থাকবে, তুমি আমার কাছে আট বছর কাজ করবে, দশ বছরও করতে পারো তবে সেটা তোমার ইচ্ছা। মূসা বললেন, আমি যদি উভয় মেয়াদই পূর্ণ করি তাহলে আমার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই থাকবে না। আমি রাজী এবং ঈশ্বর এর সাক্ষী। মেয়াদ পূর্ণ করার পর মূসা সপরিবারে (স্ত্রী সফুরা সহ) যাত্রা করলেন, পথে চলতে চলতে তুর পর্বতের চূড়ায় আগুন দেখতে পেলেন। মূসা পরিজনবর্গকে অপেক্ষা করতে বলে একাকী সেই পাহাড়ের ওপরে উঠলেন। সেখানেই মূসা বাণী শুনতে পেলেন। আমিই ঈশ্বর, তুমি তোমার হাতের যষ্ঠি ভূমিতে নিক্ষেপ করো। নিক্ষেপ করা মাত্র সেটি একটি সাপ হয়ে ছুটোছুটি করতে লাগল। মূসা দেখে ভীত হলেন। ঈশ্বর আবার বললেন, ভয় পেয়ো না মূসা, অগ্রসর

হও। তোমার হাত তোমার বাহুমূলে রাখ, দেখবে তা উজ্জ্বল হয়ে বের হয়ে আসবে। ঈশ্বরের কাছ থেকে মূসা এরকম দুটি প্রমাণসিদ্ধ আশ্চর্যজনক ক্ষমতা লাভ করেন এবং ঈশ্বরের আদেশে তিনি ফারাউনের কাছে গেলেন।' (২৮ : ১-৩)

'ফারাউনের রাজ সভাতে উপস্থিত হয়ে মূসা ফারাউনের যাদুকরদের আপন চমৎকারিত্বের দ্বারা পরাজিত করেন। সেই রাত্রিতেই ইস্রাইল সন্ততিদের নিয়ে আপন দেশ ফিলিস্তিনের দিকে যাত্রা করেন। সংবাদ পেয়েই ফারাউন সসৈন্যে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। মূসা তাঁর হাতের যষ্ঠীর অলৌকিক শক্তির দ্বারা সমুদ্রের মধ্যে পথ সৃষ্টি করেন যার মধ্যে দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়ের সকলে পার হয়ে গেলো। যখন ফারাউনের সৈন্যরা সেই পথে চলতে গেলো তখন সমুদ্র আবার পূর্ব অবস্থানে ফিরে এল। ফারাউনের সমস্ত সৈন্য ধ্বংস হলো, পথে ইস্রাইল সন্ততিতের জন্য ঐশী আহার্য মন্ন ও সালওয়া এসেছিল। যখন মূসা ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলা এবং তাঁর আদেশ প্রাপ্তির জন্য গিয়েছিলেন, তখন ইস্রাইল সন্ততিদের ভার ছিল তাঁর ভাই হারুণের ওপরে। মূসার অনুপস্থিতিতে সামরীর প্ররোচনায় ভুলে ইস্রাইলবাসীরা একটি বাছুরকে পূজা করা আরম্ভ করে। মূসাকে ক্রোধান্বিত দেখে হারুণ বলল, হে আমার সহোদর, তুমি আমার কেশ শ্মশ্রু ধরে আকর্ষণ করো না। আমি এই ভেবে ভীত ছিলাম যে তুমি এসে একথা না বলো যে আমি বনি ইস্রাইলীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছি। সামরী জিব্রাইলের ধূলি নিক্ষেপ করে গোবৎসটির মধ্যে শব্দেরও সৃষ্টি করেছিল।' (২০ : ৩ : ৫)

'যখন মূসা ঈশ্বরের কাছে কথা বলতে যান, তখন তিনি ঈশ্বরের দর্শন কামনা করেন। ঈশ্বর বললেন, তুমি তা সহ্য করতে পারবে না। বরং তুমি ওই পাহাড়ের দিকে দেখো। যখন ঈশ্বর পাহাড়ে তাঁর জ্যোতির বিকাশ ঘটালেন তখন সেই তেজ দেখে মূসা মূর্ছিত হয়ে পড়েন। তারপর ঈশ্বর ফলকের ওপরে তাঁর বাণী ও আদেশ লিপিবদ্ধ করে মূসাকে দান করেন।' (৭ : ১৬-১৮)

দাউদ

(১) মহাত্মা দাউদ—'আমি (ঈশ্বর) পর্বতদের দাউদের অধীনস্থ করে দিয়েছিলাম। পর্বতকুল এবং পক্ষীকুলও দাউদের সঙ্গে আমার (ঈশ্বরের) স্তুতিগান করত। আমি তাকে তোমাদের জন্য বর্ম নির্মাণের কারিগরী শিক্ষা দিয়েছিলাম, যার দ্বারা যুদ্ধে তোমরা জয়লাভ করতে পারো।' (২১ : ৬ : ৪-৫)

এই বিষয়ে অন্যত্র বলা হয়েছে—

'হে পর্বতমালা! তোমরা দাউদের সঙ্গে আমার পবিত্রতা ঘোষণা করো, এবং হে বিহঙ্গকুল তোমরাও, এই আদেশ দান করেই আমি দাউদকে অনুগ্রহ করেছিলাম এবং লৌহকে তাঁর জন্য নমনীয় করেছিলাম।' (৩৪ : ২ : ১-২)

'আমার (ঈশ্বরের) সেবক দাউদকে স্মরণ করো, যে শক্তিমান এবং অনুরক্ত

ছিল। আমি পর্বতকে তাঁর অধিকারভুক্ত করেছিলাম যারা সকালে ও সন্ধ্যায় তাঁর স্তুতিগান করত, সমস্ত পক্ষীকুলও তাঁর অনুরক্ত ছিল। তাঁকে আমি রাজ্যবল, চাতুর্য এবং বাক্যবিন্যাসের শক্তি দান করেছিলাম। তোমার নিকটে সেই কলহ-কারীদের সংবাদ এসেছে, যারা প্রাচীর অতিক্রম করে প্রার্থনা গৃহে প্রবেশ করেছিল। যখন তারা দাউদের নিকটে উপস্থিত হলো, তখন সে ভীত হলো। তারা বলল, ভয়েভীত হয়ো না। আমরা দুজন বাদী ও প্রতিবাদী। আমরা একে অপরের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। আমাদের প্রতি ন্যায় বিচার করো, উপেক্ষা করো না, আমাদের সঠিক পথ নির্দেশ করো। এ আমার ভাই, এর নিরানব্বইটি দুম্বা (বিশেষ ধরনের মেষ) আছে আর আমার আছে একটি। তবুও সে আমার একটি মাত্র দুম্বার প্রতি লোভের দৃষ্টি দেয়, আমাকে বলে দুম্বাটিকে তাকে দিয়ে দিতে এবং বাক্‌চাতুর্যে সে আমাকে পরাজিত করেছে। দাউদ বলল, তোমার দুম্বাটিকে তার দুম্বাগুলির সঙ্গে যুক্ত করতে চেয়ে সে তোমার ওপরে জুলুম করেছে। যৌথ বিষয়ে শরিকদের একে অন্যের প্রতি অনেক সময় অন্যায় অবিচার করে থাকে, কেবল বিশ্বাসী ও সৎ ব্যক্তিগণ এরকম করে না, তারা সংখ্যায় অল্প। দাউদ বুঝতে পারল, আমি (ঈশ্বর) তাঁকে পরীক্ষা করছি। অতঃপর সে তাঁর প্রতিপালকের কাছে ভিক্ষা মার্জনা করল, দণ্ডবৎ করল, এবং অনুরক্ত হলো। অতঃপব আমি (ঈশ্বর) তাঁকে ক্ষমা করলাম, আমার কাছে তাঁর জন্য উচ্চতম স্থান এবং উচ্চ মর্যাদা পরিণাম হিসাবে আছে। হে দাউদ, আমি তোমাকে পৃথিবীতে আপন প্রতিনিধি করেছি।' (৩৮ : ২ : ২-১২)

দাউদের নিরানব্বই জন স্ত্রী ছিল। সে প্রতিবেশী এক স্ত্রীলোককে দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকেও বলপূর্বক নিজের স্ত্রীদের মধ্যে সামিল করতে চায়। সেই উদ্দেশ্যে সে উক্ত স্ত্রীলোকের স্বামীকে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেয়, এবং যুদ্ধে লোকটির মৃত্যু হয়। এরপর দাউদ সেই বিধবা স্ত্রীকে বিবাহ করে। দাউদ নিয়ম করেছিল, একদিন দরবারে বসবে, একদিন ঈশ্বর আরাধনা এবং একদিন অন্তঃপুরে বাস করা। *এটি সেই দিন ছিল যেদিন দুই দেবদূত ঘরের দরজা রুদ্ধ দেখে দেওয়াল* ভেদ করে ঘরে প্রবেশ করে দাউদের উপরোক্ত কাজকে অনুচিত বলে জানিয়ে দেয়।

এরকম অনেক ইহুদী ও ঈসাই (খৃস্টান) মহাত্মা, যবন সিকান্দার, (গ্রীক আলেকজাণ্ডার) হাবসী লোকমান ইত্যাদি অনেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের বর্ণনা কোরাণ শরীফে পাওয়া যায়। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় সে সমস্ত বর্ণনা দেওয়া গেলো না।

ষষ্ঠ বিন্দু

ঈশ্বর, ফেরেস্তা. শয়তান

বিশ্বের প্রায় প্রতিটি ধর্মই সমস্ত জাগতিক বস্তুকে দুভাগে ভাগ করে, জড় এবং চেতন। জড় পদার্থের বর্ণনা পাঠক স্থানে স্থানে নিজেই অনুভব করতে পারবেন। এখানে চেতন পদার্থের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। চেতনের মধ্যেও দুটি অংশ আছে, ঈশ্বর এবং জীব। জীবের মধ্যে ফেরেস্তা, শয়তান প্রভৃতিও পড়ে।

ঈশ্বর

ঈশ্বরকে কোরাণ শরীফ সমস্ত সৃষ্টির কর্তা, ধারক এবং হর্তা স্বীকার করেছেন। নিম্নে বর্ণিত বাক্য থেকে তার উদাহরণ পাওয়া যেতে পারে—

'তিনি (ঈশ্বর) ভূমিতে যা কিছু আছে, তার সমস্তকেই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।' (২ : ৪ : ৯)

'তিনি সত্যসত্যই ভূমি এবং আকাশ সৃষ্টি করেছেন। ক্ষুদ্র বীর্যবিন্দু থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তিনি পশুদের সৃষ্টি করেছেন যাদের কাছ থেকে আমরা শীতবস্ত্র সহ অনেক উপকার পেয়ে থাকি এবং তাদের মাংস ভক্ষণ করি।' (১৬ : ১ : ৩-৫)

'তিনিই তোমাদের ঈশ্বর যিনি সমস্ত কিছুরই সৃষ্টিকর্তা এবং তিনি ছাড়া আর কেউ পূজ্য নয়।' (৪ : ৭ : ২)

'ঈশ্বর সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং অধিকারী।' (৩৯ : ৬ : ১০)

'নিঃসন্দেহে ঈশ্বর ভূমি এবং আকাশকে ধারণ করে আছেন, যাতে তা নষ্ট না হয়ে যায়।' (৩৫ : ৫ : ৪)

'ঈশ্বর কাউকে মারেন আবার জীবিত করেন।' (৫৩ : ৩ : ১২)

ঈশ্বর অত্যন্ত দয়ালু, তিনি অপরাধ ক্ষমা করেন—

'নিঃসন্দেহ, তোমাদের ঈশ্বর মানুষের জন্য তাদের অপরাধ ক্ষমা করেন।' (১৩ : ১ : ৬)

শুধুমাত্র এই ক্ষমা আস্তিকদের প্রতিই প্রযোজ্য নয় কাফিররাও এ থেকে বঞ্চিত হয় না—

'এই বিষয়ে তোমার (মুহম্মদ) কিছুই করণীয় নেই, ঈশ্বর ইচ্ছা করলে তাদের (কাফির) ক্ষমা করতেও পারেন, শাস্তিও দিতে পারেন, যদি তারা অত্যাচারী হয়।' (৩ : ১৩ : ৮)

'ঈশ্বর পরমসত্য।' (৩১ : ৩ : ১১)

ঈশ্বর অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ। এ বিষয়ে বলা হয়েছে—

'কেয়ামতের (পূর্ণ বিচার) দিন আমি (ঈশ্বর) সঠিক ন্যায়দণ্ড স্থাপন করব, সুতরাং কারও প্রতি বিন্দুমাত্র অন্যায় করা হবে না। তাদের কর্ম যদি এক সরিষা পরিমাণও হয় তাহলেও তারা পূর্ণ বিচার লাভ করবে কারণ আমার কাছে তারও হিসাব থাকবে।' (২১ : ৪ : ৬)

ঈশ্বরের গুণাবলী সম্বন্ধে নিম্নের বাক্যে বলা হয়েছে—

'ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নাই। তিনি চিরবিরাজমান এবং চিরসত্য। তাঁকে তন্দ্রা কিংবা নিদ্রা স্পর্শ করে না। ভূমি ও আকাশে যা কিছু বর্তমান, সমস্তই তাঁর। কে এমন আছে যে তাঁর আজ্ঞা ব্যতিরেকে তাঁর কাছে সুপারিশ করতে পারে? তিনি সর্বজ্ঞ। তিনি সম্মুখে অথবা পশ্চাতে কি আছে তার সমস্তই অবগত। তিনি স্বয়ং ইচ্ছা না করলে তার সমস্ত জ্ঞান সম্বন্ধে কেউ কোনো ধারণাই করতে সক্ষম নয়। বিশাল ভূমি এবং আকাশে তাঁর আসন, যার রক্ষণাবেক্ষণ কখনোই তাঁকে পরিশ্রান্ত করে না। তিনি উত্তম এবং মহান্।'

(২ : ৩৪ : ২)

ঈশ্বর মাতা-পিতা স্ত্রী-পুত্র রহিত—

'তিনি জাতক নন, তিনি জনকও নন।' (১১২ : ১ : ৩)

ঈশ্বরের পথে ব্যয় সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'কে আছে যে ঈশ্বরকে ভালোমতো ঋণ দেবে, তিনি তাকে কয়েকগুণ বর্ধিত করে ফেরৎ দেবেন।' (২ : ৩২ : ৩), (৫৭ : ২ : ১)

'নিঃসন্দেহ, দানশীল স্ত্রী-পুরুষ যারা ঈশ্বরকে উত্তম ঋণ প্রদান করেছে, তাদের সেই পরিমাণ দ্বিগুণ হবে, এবং তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে।'

(৫৭ : ২ : ৮)

ঈশ্বরের রূপ

ইসলামের মধ্যেও কিছু লোক ঈশ্বরকে সাকার মনে করে। তাঁরা তাদের সমর্থনে কোরাণ শরীফের নিম্ন বাক্যটিকে উদাহরণ হিসাবে উপস্থিত করেন।

'তিনি (ঈশ্বর), যিনি ছয়দিনে ভূমি ও আকাশ নির্মাণ করেছেন এবং তৎপরে 'আরশ' (ঈশ্বরের আসন)-এর ওপরে বিরাজমান হয়েছেন!' (৫৭ : ১ : ৪)

(১০ : ১ : ৩), (১৩ : ১ : ২), (৩২ : ১ : ৪),

সাকার ঈশ্বর

'কৃপালু ঈশ্বর আরশের ওপরে বিরাজমান হলেন। তাঁর আরশ জলের ওপরে অবস্থিত।' (২০ : ১ : ৫)

যে ফেরেস্তারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা তার চারপাশ ঘিরে ঈশ্বরের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।' (৪০ : ১ : ৭)

'আর কেয়ামতের দিনে যে ফেরেস্তারা নিকটে থাকবে এবং তাদের মধ্যে আটজন ঈশ্বরের আরশকে তুলে ধরবে।' (৬৯ : ১ : ১৭)

'কেয়ামতের দিনে ঈশ্বর তাদের আবরণমুক্ত করবেন এবং সকলকে প্রমাণের জন্য আহ্বান করবেন। কিন্তু কাফিররা তা করতে সমর্থ হবে না।' (৬৮ : ২ : ৯)

এখানে 'আরশ' ঈশ্বরের সিংহাসনের নাম। আরশের জলের ওপরে অবস্থানের কথা পুরাণের অনন্তশয্যায় শায়ী বিষ্ণুর কথা মনে পড়ায়। এই মতকে যারা স্বীকার করেন, তারা ঈশ্বরকে সপ্ত আকাশের ওপবে অধিষ্ঠিত সিংহাসনে আসীন মনে করেন। সেখান থেকে ঈশ্বর ফেরেস্তাদের সাহায্যে সমগ্র সৃষ্টিকে শাসন করেন। তারা বলেন যদি ঈশ্বর সব সময় সর্বত্র উপস্থিত থাকেন তাহলে জিব্রাইলের মাধ্যমে মহাত্মা মুহম্মদের কাছে কোরাণ পাঠাবার কি প্রয়োজন ছিল? ঈশ্বর পুরীষ-মূত্রাদি পূর্ণ ঘৃণিত স্থানে বাস করেন না।

ঈশ্বর নিরাকার

পবিত্র কোরাণে এই সিদ্ধান্তও ভালোমতো প্রতিপাদিত করা হয়েছে যে ঈশ্বর অদ্বিতীয়, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক, অনুপম এবং অতিসমীপ। নিম্নের বাক্য এই বক্তব্যকে প্রতিপাদিত করে—

'নিঃসন্দেহ, তোমার ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় তিনি ব্যতীত আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি কৃপালু এবং ক্ষমাশীল।' (২ : ১৯ : ১১)

'ঈশ্বর সাক্ষ্য দেন যে তিনি ব্যতীত আর কেউ পূজ্য নয়। ফেরেস্তা এবং জ্ঞানীজনেরা এই মতে দৃঢ় যে ঈশ্বর ব্যতীত আর কেউ উপাস্য নয় এবং তিনি শক্তিমান এবং জ্ঞানী।' (৩ : ৮ : ৯)

'তিনি আদি, তিনিই অন্ত। তিনি বাইরে আছেন, অন্তরেও আছেন। তিনি সর্ববিষয়ে জ্ঞানের অধিকারী।' (৫৭ : ১ : ৩)

'নিঃসন্দেহ, ঈশ্বর তাঁর জ্ঞানের দ্বারা সমস্ত বস্তুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন।' (৬৫ : ২ : ৫)

'কাফির নাস্তিকেরা ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করলেও, তিনি সর্বব্যাপক।' (৫১ : ৬ : ১০)

'সেই ঈশ্বরের সদৃশ কোনো বস্তু নেই।'

'আমি (ঈশ্বর) সজীব ধমনীর মতোই তোমার সমীপবর্তী।'

ঈশ্বরকে একদেশীয় এবং সাকার মান্যকারীরা উপরে বর্ণিত সর্বব্যাপক ইত্যাদি বিশেষণকে 'জ্ঞানের দ্বারা সর্ব ব্যাপক' এই অর্থ করে থাকেন। এইভাবে আবার সর্বব্যাপকতাবাদীরা আরশের অর্থ করেন শাসন। এভাবেই অন্যান্য অর্থেও

পরিবর্তন ঘটান। তবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে ইসলামের প্রাচীন ভাষ্যকারেরা এবং হাদীস গ্রন্থেও সর্বদাই কোনো একপক্ষকে পরিত্যাগ করে অন্যপক্ষকে সমর্থন করা হয়নি। এই সাকারবাদের ভিত্তিতেই মহাত্মা মুহম্মদের 'মিঅরাজ' যাত্রার অনেক কাহিনী উপরোক্ত গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। এখানে তার উদাহরণ দেওয়া সঠিক হবে না। 'মিঅরাজ' সম্বন্ধী আয়াত একাদশ বিন্দুতে এসেছে।

ফেরেস্তা (দেবদূত)

পুরাণে যেমন ভগবানের পরে আরও অনেক দেবতা ভিন্ন ভিন্ন কাজের দায়িত্বে আছেন বলে ধরা হয়, যেমন যমরাজ মৃত্যুর প্রধান, ইন্দ্র বৃষ্টির প্রধান ইত্যাদি, ইসলামেও ফেরেস্তাদের ভূমিকা অনেকটা সেই রকম। এজন্য কোরাণ শরীফের ফেরেস্তা সম্বন্ধীয় কিছু বাক্যের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

'যখন আমি (ঈশ্বর) ফেরেস্তাদের আদমকে দণ্ডবৎ করতে বললাম, তখন সকলেই দণ্ডবৎ করল, কেবল ইব্‌লিস তা করতে অস্বীকার করল, গর্ব প্রকাশ করল এবং অবিশ্বাসীদের দলভুক্ত হলো।' (২ : ৪ : ৫) (২০ : ৭ : ১)

'যখন আমি (ঈশ্বর) সকল ফেরেস্তাদের আদমকে দণ্ডবৎ করতে বললাম, তখন ইব্‌লিস ব্যতীত সকলেই তা করল। ইব্‌লিস বলল, আমি কেন তাকে দণ্ডবৎ করব, যে মাটি দিয়ে তৈরি।' (১৭ : ৭ : ১)

'যখন আমি (ঈশ্বর) ফেরেস্তাগণকে বললাম, আদমকে দণ্ডবৎ করো, তখন সকলে দণ্ডবৎ করল, কিন্তু ইব্‌লিশ যে জিনদের মধ্যে একজন ছিল, সে তা করল না।' (২০ : ১১৬)

উপরে বর্ণিত বাক্যের মধ্যে ফেরেস্তাদের বর্ণনা এসেছে। ঈশ্বর আদমকে (মনুষ্য জাতির আদি পিতা) সৃষ্টি করে তার প্রতি প্রণত হওয়ার জন্য সমস্ত ফেরেস্তাদের আদেশ করেছিলেন। সব ফেরেস্তাই ঈশ্বরের আদেশ মান্য করে সেরকম করলেও ইব্‌লিস তা করেনি। এই ইব্‌লিস ফেরেস্তাদের মধ্যে প্রধান ছিল। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে ইব্‌লিসকে জিন বলা হয়েছে, এ থেকে মনে হয় ফেরেস্তা আর জিন একই কিংবা জিন ফেরেস্তাদের অন্তর্ভুক্ত কোনো একটি গোষ্ঠী। ইব্‌লিস এই কথা বলে আদমকে দণ্ডবৎ করতে অস্বীকার করেছিল যে আদম মাটি দিয়ে তৈরি। এ থেকে মনে হয় মাটির চেয়ে কোনো উচ্চতর পদার্থের দ্বারা ফেরেস্তাদের সৃষ্টি। অন্যত্র ইব্‌লিসের কথা থেকে জানা যায় সে অগ্নি দ্বারা সৃষ্ট। আপন ভক্তদের রক্ষার জন্য ঈশ্বর প্রয়োজনে এই ফেরেস্তাদের পাঠিয়ে থাকেন। যেমন—

ফেরেস্তাদের সাহয্যতা

'হে বিশ্বাসীগণ ! নিজেদের ওপরে ঈশ্বরের কৃপা স্মরণ করো, যখন তোমাদের প্রতি শত্রু বাহিনী ধাবিত হয়েছিল, তখন আমি (ঈশ্বর) শত্রু ফৌজের প্রতি ঝড় তুফান পাঠিয়েছিলাম এবং সঙ্গে এক ফেরেস্তাদের বাহিনীও পাঠিয়েছিলাম, যাকে তোমরা দেখতে পাওনি।' (৩২ : ২ : ১)

উপরোক্ত বাক্য কোনো একটি যুদ্ধ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে, যখন শত্রু সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে কয়েকগুণ বেশী ছিল। সেই সময় ঈশ্বরের কোপ ঝড় তুফানের রূপে শত্রুদের ওপরে বর্ষিত হয়েছিল এবং ঈশ্বর মুসলমানদের সাহায্যার্থে একটি ফেরেস্তা বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।

এই ফেরেস্তারা বিশ্বাসীদের (আস্তিক) কাছে আসে—

'যে বলে ঈশ্বর আমার প্রভু এবং সেই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকে তার কাছে ফেরেস্তা আসে এবং বলে—ভীত হয়ো না, আফসোস করো না, স্বর্গের সুসমাচার শোনো, যার প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি তোমাকে দেওয়া হয়েছে।' (৪১ : ৪ : ৫)

প্রত্যেক মানুষের শুভ অশুভ কর্মের লেখক এবং রক্ষক হলো ফেরেস্তারা। এ বিষয়ে বলা হয়েছে—

'নিঃসন্দেহ, তোমার ওপরে রক্ষক আছে, কিরামন্, কাতিবীন। যা কিছু তুমি করো সবই তাঁদের জ্ঞাত।' (৮২ : ১ : ১০-১২)

হাদীস এবং ভাষ্য (তফসীর) গ্রন্থে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক মানুষের কাঁধে কিরামন্ এবং কাতিবীন এই দুই ফেরেস্তা আসীন থাকে, যার মধ্যে একজন মানুষের সমস্ত সুকর্ম এবং দ্বিতীয়জন সমস্ত দুষ্কর্মের হিসাব রাখে।

ফেরেস্তাদের পাখা

এ সমস্ত ফেরেস্তাদের পাখাও থাকে।

'সমস্ত প্রশংসা সেই ঈশ্বরের জন্য। যিনি দুই, তিন কিংবা চারটি পাখাযুক্ত ফেরেস্তাদের তাঁর দূত রূপে নিযুক্ত করেছেন।' (৩৫ : ১ : ১)

কিছু ফেরেস্তাদের নামও এভাবে এসেছে—

'বলো (হে মুহম্মদ)! নিঃসন্দেহ যিনি ঈশ্বরের আদেশে তোমার প্রতি এই কোরাণ অবতীর্ণ করেছেন…সেই জিব্রাইলের যারা শত্রু তারা ঈশ্বর এবং তাঁর প্রেরিত রসুলদের, সে ফেরেস্তাদের, জিব্রাইলের, মিকাইলেরও শত্রু হয়। নিঃসন্দেহ, ঈশ্বর সেই সমস্ত কাফিরদেরও (নাস্তিক) শত্রু।' (২ : ১২ : ১, ২)

উপরে বর্ণিত দুই ফেরেস্তার মধ্যে জিব্রাইল সমস্ত ফেরেস্তাদের মধ্যে প্রধান, এবং মিকাইল মৃত্যুর ফেরেস্তা অর্থাৎ পুরাণে যমরাজের মতো, যার কাজ আয়ু সমাপ্ত হলে সকলকে মারা। এ ভাবে হাদীস শরীফে আরও অনেক ফেরেস্তাদের

নাম ও কাজের ধারা বর্ণিত আছে। ইস্রাফিল যখন তার শিঙা বাজাবে তখনই মহাপ্রলয় আরম্ভ হবে।

শয়তান (পাপাত্মা)

ফেরেস্তা ছাড়া কোরাণে আর-এক ধরনের অদৃশ্য প্রাণীদের কথা বর্ণিত হয়েছে, যারা সর্বত্র গমনাগমনে ফেরেস্তাদের মতোই ক্ষমতাবান, কিন্তু তারা মানুষকে সৎকর্ম থেকে দূরে সরিয়ে অসৎকর্মে লিপ্ত হবার প্ররোচনা দেয়। এদের শয়তান বলা হয়। আমরা এই গ্রন্থে তাদের বিষয়ে 'পাপাত্মা' শব্দটি ব্যবহার করেছি। শয়তানদের মধ্যে সকলের প্রধান হলো সেই ইব্‌লিস, যার নাম এর আগে একাধিকবার এসেছে এবং যে আদমকে দণ্ডবৎ করতে অস্বীকার করেছিল। শয়তানের বিষয়ে বলা হয়েছে—

'একমাত্র শয়তানই তোমাদের বন্ধুদের সম্বন্ধে তোমাদের ভীত করে' (৩ : ১৮ : ৪)

শয়তান কিভাবে মানুষকে অসৎ কর্মে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করে, তার উদাহরণ হিসাবে—

'শয়তান তার কার্যাবলীকে শোভনরূপে উপস্থিত করে এবং বলে, আমি তোমাদের রক্ষক, এখন আর কোনো মানুষই তোমাদের ওপরে বিজয়ী হতে পারবে না। কিন্তু যখন উভয়পক্ষ পরস্পরের সম্মুখীন হয়, তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, আমি তোমাদের থেকে আলাদা, আমি নিঃসন্দেহে সেই সব দেখতে পাই যা তোমরা দেখতে পাও না। ঈশ্বর কঠোরভাবে পাপ নাশ করেন।' (৮ : ৬ : ৪)

সেজন্যই বলা হয়েছে—

'বলো আমার প্রভু! শয়তানের প্রলোভনের মধ্যেও আমি তোমার শরণাগত হয়েছি।' (২৩ : ৬ : ৫)

কার্যসিদ্ধির পর শয়তানের স্বরূপ বর্ণনা—

'কার্যসিদ্ধি হয়ে যাবার পর শয়তান বলে—নিঃসন্দেহে তোমাদের ঈশ্বর তোমাদের সঠিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমিও তোমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম কিন্তু পালন করিনি। তোমাদের ওপরে আমার তো কোনো অধিকার ছিল না, আমি কেবল তোমাদের আহ্বান করেছিলাম এবং তোমরা তাতে সাড়া দিয়েছিলে। সুতরাং আমার প্রতি কোনো দোষারোপ করো না, দোষ দিতে হলে নিজেদেরকেই দাও। আমি কোনোভাবেই তোমাদের সহায়ক নই, তোমরাও কোনোভাবে আমার সাহায্যকারী নও।' (১৪ : ৪ : ১)

ইব্‌লিসকে স্বর্গ থেকে বহিষ্কার

শয়তানের গতিবিধি শুধুমাত্র মাটিতেই সীমাবদ্ধ নয়, সে আকাশেও হানা দিয়ে থাকে।

'নিঃসন্দেহ, আমি আকাশে মিনার নির্মাণ করেছি এবং তাকে দর্শকদের দৃষ্টিনন্দন করেছি এবং সমস্ত ধরনের দুষ্ট শয়তানদের হাত থেকে তাকে রক্ষা করেছি। আর যারা গোপনে আকাশের সংবাদ শুনতে চাইল তাদের উজ্জ্বল অগ্নিশিখার মতো নক্ষত্ররা তাড়া করল।' (১৫ : ২ : ১-৩)

যদিও শয়তানদের আকাশের দিকে যাওয়া নিষিদ্ধ তবুও গোপনে, লুকিয়ে তারা আকাশের কথা জানবার উদ্দেশ্যে সেখানে যায় এবং সেখান থেকে বিতাড়িত হয়। সেগুলিই হলো নক্ষত্র পতন বা উল্কাপাত।

শয়তানের অনুগামী মানুষের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'মানুষের মধ্যে যারা সম্যক জ্ঞান ব্যতিরেকেই ঈশ্বর সম্বন্ধে বিতর্ক করে, তারা অবাধ্য শয়তানদেরই অনুসরণ করে।' (২২ : ১ : ২)

শয়তানদের প্রধান ইব্‌লিসের স্বর্গ থেকে বহিষ্কার সম্বন্ধে কোরাণ শরীফে যা বলা হয়েছে—

'যখন আমি তোমাকে সৃষ্টি করি, তোমার মুখ গড়ি, তারপর ফেরেস্তাদের বলি—আদমকে দণ্ডবৎ করো। তারা সকলেই আমার আজ্ঞা পালন করল, কেবল ইব্‌লিস দণ্ডবৎকারীদের মধ্যে ছিল না।'

দুষ্ট শয়তান

'ঈশ্বর বললেন—যখন আমি তোমাকে আদেশ করেছি তখন কে তোমাকে নিষেধ করল?'

'ইব্‌লিস বলল, আমি ওর চেয়ে উত্তম। আমার সৃষ্টি অগ্নি থেকে আর ওর মাটি থেকে।'

'ঈশ্বর বললেন, তুমি এই স্বর্গ থেকে বহিষ্কৃত হও। কারণ এটা কখনোই সঠিক নয় যে তুমি এখানে থেকে গর্ব প্রকাশ করবে। তুমি স্থান ত্যাগ করো, কারণ তুমি অতিশয় ক্ষুদ্র।'

'ইব্‌লিস বলল, আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবসর দাও।'

'ঈশ্বর বললেন, তুমি প্রতীক্ষাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে।'

'ইব্‌লিশ বলল, তুমি যেমন আমার সর্বনাশ করলে আমিও তোমার সৃষ্ট মানুষের সর্বনাশ করার জন্য তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকব। তারপর আমি তাদের সম্মুখে, পশ্চাতে, ডাইনে, বামে উপস্থিত হব, এবং তাদের মধ্যে অনেককেই তুমি কৃতজ্ঞ রূপে পাবে না।' (৭ : ২ : ১১-১৭)

দুষ্ট শয়তান এতই ভীতিপ্রদ যে বলা হয়েছে—

'যখন তুমি কোরাণ শরীফ পাঠ করবে, তখন দুষ্ট শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ঈশ্বরের শরণ প্রার্থনা করো।' (১৬ : ১৩ : ৯)

ওপরে ফেরেস্তা এবং শয়তান সম্বন্ধীয় বর্ণনা পাঠ করার পরও প্রশ্ন উঠতে পারে—যেভাবে ঈশ্বরের বিভিন্ন প্রকারের লক্ষণ বর্ণিত হয়েছে তেমন জীবের লক্ষণ সম্বন্ধে কি বলা হয়েছে? এই প্রশ্ন তখনও লোকে মহাত্মা মুহম্মদকে করেছিল এবং যার সম্বন্ধে কোরাণ শরীফ ছোট একটি বাক্য ছাড়া আর বিশেষ কিছুই বলেনি।—

'কুলরুর্হু মিনত্রি রব্বী'

(বলো, জীব আমার ঈশ্বরের ইচ্ছায় সৃষ্ট)

সপ্তম বিন্দু

সৃষ্টি, কর্মফল, স্বর্গ, নরক

ঈশ্বর ইত্যাদি অদৃষ্ট বস্তুর বর্ণনা আমরা ষষ্ঠ বিন্দুতে করেছি। এবার আমরা মানুষের কর্ম, তার ফলাফল, স্বর্গ ইত্যাদির বর্ণনা করব। সৃষ্টি থেকে তার সৃজনহারের অনুমান হয়ে থাকে, যেমন হয় কার্য থেকে কারণের, ব্যবস্থার বৈচিত্র্য, রচনার বৈশিষ্ট্য, সৌন্দর্য প্রভৃতি গুণের আধিক্য ইত্যাদির দ্বারা জগৎকে অনন্যসাধারণ শিল্প চাতুর্য পূর্ণ কোনো শক্তির দ্বারা নির্মিত মনে হয়। কোনো কোনো দার্শনিক সৃষ্টিকে ভ্রমাত্মক বর্ণনা করে তার সত্তাকে অস্বীকার করার চেষ্টা করে, কিন্তু কোরাণ শরীফ সেভাবে জগতের মিথ্যা হওয়াকে স্বীকার করে না। বলা হয়েছে—

'আকাশ, পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী যা কিছু আছে, তার সমস্তই ক্রীড়াচ্ছলে নয়, এক নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে।' (৪৬ : ১ : ৩), (৪৪ : ২: ৯) (৪৫ : ৩ : ১)

সংসারের তুচ্ছতার বর্ণনা করা হয়েছে কারণ সংসার অস্থির। সংসারের মধ্যেই স্বর্গ ইত্যাদি স্থান নিত্য, সেজন্য তার প্রলোভন সৎকর্মীদের বিশেষ অবস্থায় দেওয়া হয়েছে। সংসার এবং সংসারের সমস্ত বস্তুই ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রমাণভূত নিদর্শন। সে জন্যই বহু জায়গায় ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভারে নম্র হবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে।

সৃষ্টি

'কেন ঈশ্বরে অবিশ্বাস করো, তোমরা তো মৃত ছিলে, অতঃপর তিনি তোমাদের জীবনদান করেছেন। আবার তিনিই মারবেন এবং পুনরায় জীবিত করবেন, অন্তিমে তাঁর কাছেই যেতে হবে। তিনি তোমাকে, এবং বিশ্বচরাচরে যা কিছু বর্তমান, সবই সৃষ্টি করেছেন, তারপর আকাশে আরোহণ করেছেন এবং সাত খণ্ডে আকাশকে বিভক্ত করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ব বিষয়েই চরমজ্ঞানী।'

(২ : ৩ : ৮, ৯)

পুনরায়

'তিনি তোমাদের জন্য নক্ষত্ররাশি সৃষ্টি করেছেন, যার সাহায্যে অরণ্য, সাগর এবং অন্ধকারে পথ দেখতে পাও।···তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন। অতঃপর সমস্ত অঙ্কুরের উদ্গম হয়। তারপর বনস্পতি বিকশিত করেন, এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত ফল সৃষ্টি করেন। কত খেজুরগুচ্ছ কাণ্ড থেকে ঝুলতে থাকে। অনুপম অঙ্গুর, ডালিম ও জয়তুনের উদ্যান। যখন ওই সমস্ত ফল ফলে

এবং পরিপক্ক হয় তখন তাদের প্রতি লক্ষ্য করো। এই সমস্ত কিছুর মধ্যেই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য প্রমাণ নিহিত আছে।' (৬ : ১২ : ৩, ৫)

অন্যত্র

'তুমি কি দেখছ না যে ঈশ্বরই পৃথিবীতে জলধারা এনেছেন, অতঃপর তা থেকে অনেক প্রকারের উত্তম ফল এবং পর্বতের মধ্যে শ্বেত, লোহিত ও অতি কৃষ্ণ ইত্যাদি নানা বর্ণের উপত্যকার সৃষ্টি হয়েছে। কীট, পশু ও মানুষের মধ্যে বিভিন্ন বর্ণের প্রজাতি বর্তমান। এই সমস্ত বিষয়ে যারা সম্যক জ্ঞানের অধিকারী, তাঁরা ঈশ্বরকে ভয় করেন। ঈশ্বর নিঃসন্দেহে ক্ষমাশীল এবং শক্তিশালী।'

(৩৫ : ৪ : ১,২)

ঈশ্বরের কৃপা কটাক্ষে মানুষের কোটি কোটি উপকার হয়ে চলেছে, সেজন্যই তাঁর প্রতি কৃতঘ্ন হওয়া অনুচিত।

জগতের উৎপত্তির কারণ সম্বন্ধে কোরাণ শরীফে দুটি মাত্র শব্দ ব্যবহার করে যা বলা হয়েছে তা থেকেই সমস্ত বিষয় স্বচ্ছ হয়ে যায়। তা হলো—'কুন্, ফ-য়কুন' (হোক, অতঃপর তা হয়), ঈশ্বর বললেন, হোক, অতঃপর জগতের সৃষ্টি হয়। উপাদান ইত্যাদি কারণের কোনো বিতর্ক নেই। সর্বশক্তিমান হওয়ার ফলে তিনি কোনো উপাদান কারণ ব্যতিরেকেই জগত নির্মাণ করেন। এইভাবে অসৎ থেকে সতের উৎপত্তিই কোরাণ শরীফ প্রতিপাদিত সৃষ্টি। ইহুদী এবং খৃস্টান ধর্মেও সৃষ্টি বিষয়ক এই সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করা হয়েছে। তাদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যদি আর কোনো কারণ খোঁজা হয় তাহলে ঈশ্বর আর সর্বশক্তিমান থাকেন না। কারও যদি মনে হয় তিনিই নিমিত্ত এবং তিনিই উপাদান কারণ, কোরাণ শরীফে তারও সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। সেখানে এক জায়গায় বলা হয়েছে—'না তিনি উৎপাদক, এবং না তিনি উৎপন্ন হয়েছেন।' এখানে উপাদান কারণ থেকে জগৎ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের উৎপাদকতার কথা তীব্র-ভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। তারা বলেন, যদি ঈশ্বর স্বয়ং উপাদান কারণ হন, তাহলে তিনি আর নির্বিকার থাকেন না আবার তাকে যদি অন্য উপাদান কারণের সহায়তা নিতে হয় তাহলে আবার তিনি (ঈশ্বর) সর্বশক্তিমান থাকেন না।

কোরাণ শরীফে বিভিন্ন অধ্যায়ে সৃষ্টি বিষরে যা যা বলা হয়েছে তাকে সংক্ষিপ্ত রূপে এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

উপাদান কারণ বিনা সৃষ্টি

১. 'অবিশ্বাসীরা (নাস্তিকেরা) কি দেখেনি, আকাশ এবং পৃথিবী আগে এক সঙ্গে মিশে ছিল, তারপর আমি উভয়কে পৃথক করি এবং জল থেকে সমস্ত প্রাণীদের সৃষ্টি করলাম। আকাশকে সুরক্ষিত ছাদ করেছি। এ সমস্ত প্রমাণই কিন্তু তারা বিশ্বাস করে না। তিনিই রাত্রি, দিন, চন্দ্র, সূর্যকে তৈরি করেছেন,

যা সারা আকাশ পরিক্রমা করে। আমি তোমার পূর্বেও কাউকে অমর করে সৃষ্টি করিনি অতএব যদি তোমার (মুহম্মদ) মৃত্যু হয় তাহলে কি ওই সমস্ত নাস্তিকেরা অমর? সমস্ত প্রাণীই মরণশীল।' (২১ : ৩ : ১, ৩-৫)

২. 'তিনি সেই ঈশ্বর– যিনি স্তম্ভ ব্যতিরেকেই আকাশকে উর্ধ্বলোকে স্থাপন করেছেন, তোমরা তা দেখেছ, অতঃপর তিনি আরশ-এ (স্বর্গের সিংহাসন যেখানে ঈশ্বর আসীন হন) সমাসীন হলেন। সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণে আনলেন। প্রত্যেকেই এক নির্দিষ্ট সময়ানুসারে চলে থাকে। তিনি কর্ম-পরিকল্পনা করেন এবং প্রমাণ সমূহকে বিস্তার করেন যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালক সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস রাখতে পারো। তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন এবং সেখানে পাহাড়, নদী এবং সমস্ত ফল—দু'জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। বিচারশীল সম্প্রদায়ের জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে।' (১৩ : ১ : ৩,৪) (৫৭ : ১ : ৪)

সৃষ্টি

৩. 'আমি পাঁক থেকেই মানুষকে বানিয়েছি। তার আগে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি থেকে জিন সৃষ্টি করেছি।' (১৫ : ৩ : ১,২)

৪. 'মানুষকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃজন করেছি।' (১৬ : ১ : ৪)

৫. 'যিনি ছয়দিনে পৃথিবী, আকাশ এবং যা কিছু তার ভিতরে আছে, নির্মাণ করেছেন, অতঃপর স্বর্গে আসীন হয়েছেন।' (২৫ : ৫ : ১৫)

৬. 'তিনি ধন্য, যিনি আকাশে রাশিচক্র সৃষ্টি করেছেন। সেখানে আলোকময় চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাজিকে নির্মাণ করেছেন।' (২৫ : ৬ : ২)

৭. 'জুলকার্নাইন সিকান্দার (আলেকজাণ্ডার) পশ্চিম দিশাতে চলতে চলতে সূর্যাস্তর স্থান পর্যন্ত পৌঁছে যায়। যেখানে সূর্য এক পঙ্কিল নদীতে ডুবে যায়। সেই নদীর কাছে সে এক মানব সম্প্রদায়কে দেখতে পেয়েছিল।' (১৮ : ১১ : ৪)

ন্যায়দিন (কেয়ামত)

এইভাবে সৃষ্টির বর্ণনা করে তার উপভোক্তা জীবের বর্ণনা করা হয়েছে। খৃস্ট ও ইহুদী ধর্মের মতো ইসলামও জীবের বার বার জন্মগ্রহণ করাকে স্বীকার করে না। পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণী প্রথমবারই তার প্রথম শরীরে প্রবিষ্ট হয়েছে। মৃত্যুর পর তাদের আর জন্ম হবে না। তবে প্রলয় (কেয়ামত)

ক্ষেত্রে যে অসাম্য বর্তমান তা জীবের কর্মানুসারে হয়নি, হয়েছে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। আপন কর্মের ফল মানুষই ভোগ করবে, পশুপাখিরা নয়। মানুষের প্রয়োজনেই ঈশ্বর পশুপাখি সৃষ্টি করেছেন। সেই নির্ণয়-দিন এবং সে দিনের নির্ণয় সম্বন্ধে কোরাণ শরীফে নিম্নোক্ত ভাব ব্যক্ত হয়েছে—

১. 'যে পুণ্য কাজ করছে, তা তার নিজের জন্য, যে পাপ কর্ম করেছে তাও তার নিজের জন্য। তোমার ঈশ্বর তাঁর কোনো সেবকের প্রতি কোনো অন্যায় করেন না।'

২. 'সেদিন কোনো বন্ধু অপর বন্ধুর সহায়ক হবে না, তারা সাহায্যও পাবে না।' (৪৪ : ২ : ১২)

৩. 'প্রভু এক কণাও কারও প্রতি অন্যায় করেন না, যদি কারও পুণ্য থাকে তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের কাছ থেকে মহা প্রতিদান দান করেন।' (৪ : ৬ : ৭)

৪. 'সেদিন কেউ আর একজনের ভার বহন করবে না। যদি ভারের বোঝায় ভেঙে পড়ে, কাউকে সহায়তার জন্য ডাকে, তাহলেও কেউ তা বহন করবে না। তা সে আত্মীয় বন্ধু যাই হোক না কেন।' (৩৫ : ৩ : ৪)

কর্মভোগ

৫. 'যা কিছু ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন। তাতে সমস্ত প্রাণীই তাদের কর্ম অনুযায়ী ফল লাভ করবে। কেউ অন্যায়ের দ্বারা তাড়িত হবে না।' (৩৫ : ৩ : ১)

৬. 'আমার কাজ আমার জন্য, তোমার কর্ম তোমার জন্য। যা কিছু আমি করি তার জন্য তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেই এবং তোমরা যা করো সে বিষয়েও আমি দায়ী নই।' (১০ : ৫ : ১)

উপরোক্ত বাক্য সমূহ থেকে সুস্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্তই বেরিয়ে আসে যে 'অবশ্যমেব ভোক্তব্য কৃত কর্ম শুভাশুভ'। স্বীয় কৃতকর্মের শুভাশুভের ফল প্রাণীকে ভোগ করতে হবেই। তবে অনুতাপ এবং ঈশ্বর প্রেরিতের (রসুল) সুপারিশে পাপের মার্জনা পাওয়ার কথা ইসলামে স্বীকৃত হয়েছে—

'তিনি তাঁর সেবকদের অনুতাপকে স্বীকার করেন, পাপীকে ক্ষমা করেন। যা কিছু তোমরা করো, সমস্তই তাঁর জ্ঞাত।'

অনুতাপের মাধ্যমে পাপ কর্মের মার্জনা পাওয়ার কথা এখানে বলা হয়েছে। অন্যত্র বলা হয়েছে—

'সেই দিনকে ভয় করো, যেদিন কোনো একজন অন্যজনের কর্মকে বদলে দিতে পারবে না, সেদিন কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবে না। সেদিন কোনো কিছুর বিনিময় গৃহীত হবে না এবং কেউ সহায়তা পাবে না।' (২ : ৬ : ২)

যদিও উপরোক্ত বাক্যে বলা হয়েছে যে কারো সুপারিশ স্বীকৃত হবে না তা

সত্ত্বেও 'সুপারিশের মাধ্যমে পাপমোচন' ইসলামের এক সর্বমান্য সিদ্ধান্ত। তবে কোরাণ শরীফে একে প্রতিপাদিত করে এমন কোনো সুস্পষ্ট বাক্যের উল্লেখ নেই।

স্বর্গ

মানুষের এই জন্মই সর্বপ্রথম এবং সর্বশেষ। এই জন্মে কর্মফল ভোগ করা সম্ভব নয়। মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মারা স্বর্গে এবং পাপীরা নরকে এবং কোনো কোনো মতে উভয়ের মাঝামাঝি এরাফে যায়। যেমন পুরাণে অনেক ধরনের সুখ ভোগে পরিপূর্ণ স্বর্গলোকের কথা বলা আছে তেমনই এখানেও আছে। সেখানে যেমন নন্দন কানন সৌন্দর্যের খনি অপ্সরারা সেখানে আলোকিত করে রাখে, তেমনই জন্নতের উদ্যানেরও শোভা মনোরম এবং হুর-এর দল সেই উদ্যানকে আনন্দময় করে রাখে। কোরাণ শরীফে বিশ্বাসীদের (মুসলমানদের) শুভ কর্মের ফলস্বরূপ প্রাপ্তব্য স্বর্গের অনেক বিস্তৃত বর্ণনা আছে। তার মধ্য থেকে কয়েকটিকে উদাহরণ স্বরূপ এখানে দেওয়া হলো—

১. 'শুভ কর্ম করে এমন বিশ্বাসীদের শুভ সন্দেশ শোনাও—তাদেব জন্য স্বর্গোদ্যান যার নীচে স্রোতধারা প্রবাহিত। সেখানে সমস্ত উত্তম ফল রক্ষিত আছে। স্বর্গস্থিত ব্যক্তিদের যেরকম প্রতিশ্রুতি পূর্বে দেওয়া হয়েছিল সেই অনুরূপ পুরস্কার দেওয়া হবে। তাদের জন্য সেখানে সুন্দরী রমণীরা বর্তমান থাকবে এবং পুণ্যাত্মারা সেখানকার চিরস্থায়ী নিবাসকারী হবে।' (২ : ৩ : ৫)

২. 'সেদিন স্বর্গবাসীরা বিশ্রম্ভালাপ করবে। তারা এবং তাদের স্ত্রীরা ছায়ার মধ্যে উপাধান নিয়ে আসনে আসীন থাকবে। সেখানে তাদের জন্য উত্তম ফল এবং যা কিছু তারা চায় তার সবই মজুত থাকবে।' (৩৬ : ৪ : ৫-৭)

'স্বর্গের ঐশ্বর্যের মধ্যে মুখোমুখী আসনে তারা বসবে। কিশোরের দল পানীয়ের পেয়ালা নিয়ে সেখানে ঘুরছে। সেই পানীয়ের বর্ণ শ্বেত এবং স্বাদে অনুপম। সেই পানীয় কাউকে মত্ত করে না বা পান করলে কারো শিরঃপীড়া হয় না। তাদের কাছে আনত দৃষ্টি সুন্দরী রমণীরা রয়েছে যাদের নেত্র ডিম্বের ন্যায় সুন্দর।' (৩৭ : ২ : ২০-২৬)

৪. 'সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য উন্মুক্ত দ্বারের উদ্যান রয়েছে। অনেক ধরনের ফল এবং সুরা তাদের কাছে আনা হবে। তাদের কাছে সমবয়স্কা আনতদৃষ্টি সুন্দরীরা থাকবে।' (৪৮ : ৪ : ১২-১৪)

৫. 'তুমি এবং তোমার পত্নীরা সানন্দে উদ্যানে প্রবেশ করো। সেই সমস্ত স্বর্গীয়দের কাছে পেয়ালা এবং তস্তরী (রেকাবি) নিয়ে ঘুরছে চির কিশোরের দল। সেখানে সব কিছুই লভ্য—যা প্রয়োজন মনে হয় অথবা চোখে যা ভালো লাগে। তোমরা চিরকালের জন্য সেখানকার নিবাসী হবে। সেখানে সেই উদ্যান বর্তমান,

যা তুমি তোমার কর্মের বিনিময়ে লাভ করেছ। তোমার জন্য সেখানে অনেক রকম স্বাদু ফল রয়েছে, তুমি ইচ্ছা মতো সেখান থেকে গ্রহণ করো।' (৪৩ : ৭ : ৩-৬)

৬. 'স্বর্গীয় উদ্যানের যে প্রতিশ্রুতি তাদের (ধর্মভীরুদের) দেওয়া হয়েছে তার দৃষ্টান্ত—সেখানে দুর্গন্ধমুক্ত জলের স্রোত, দুধের প্রবাহ, যার স্বাদ অপরিবর্তনীয়, সুরার স্রোত যা পানকারীদের কাছে অত্যন্ত স্বাদিষ্ট ; ফেনাবর্জিত মধুর প্রবাহ ; তাছাড়াও তাদের জন্য আছে অনেক সুমধুর স্বাদের ফল।' (৪৭ : ২ : ৪)

৭. 'যথেচ্ছ আহার করো, পান করো, এ সমস্তই তোমার সেই কর্মের জন্য যা তুমি করেছ। তারা সারিবদ্ধভবে সজ্জিত আসনে বসে থাকবে। আমি তাদের বিশাললোচনা সুন্দরীদের সঙ্গে মিলন ঘটাব এবং আমি তাদের ইচ্ছানুসার মাংস ও সুস্বাদু ফল আহারের জন্য দেবো। সেখানে একে অপরকে পানীয় দেবে, যে পানীয়তে কারো নেশা হবে না কিংবা পাপ পথে যেতে প্রেরণা দেবে না। সেখানে তাদের পরিচর্যার জন্য মুক্তা সদৃশ কিশোরের দল নিযুক্ত থাকবে।' (৫২ : ১ : ২২-২৪)

৮. 'সীমান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের সন্নিকটে, যেখানে বাসোদ্যান রয়েছে।' (৫৩ : ১ : ১৫-১৬)

৯. 'ঈশ্বরের বিরোধিতায় দণ্ডায়মান হতে যারা ভয় পায় সেই সমস্ত বিশ্বাসীদের জন্য দুটি উদ্যান রয়েছে। অতএব, (হে নাস্তিক, মানুষ ও জিনের দল) তোমরা ঈশ্বরের কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ? দুটি উদ্যানেই পত্র পল্লব বিশিষ্ট বৃক্ষ রয়েছে। অতএব তোমরা প্রভুর কোন অনুগ্রহকে অস্বীকার করবে ? সেখানে দুটি ঝর্ণা আছে। অতএব··· ? সেখানে নানাধরনের উত্তম ফল রয়েছে। অতএব··· ? সেখানে তাকিয়াতে হেলান দিয়ে কোমল শয্যায় তুমি উপবেশন করবে। অতএব··· ? দুটি উদ্যানেই গাছে নানা রকমের ফল ঝুলছে। অতএব··· ? কখনো মানুষ অথবা জিন দ্বারা স্পর্শিত হয়নি এমন সমস্ত আয়তনয়না রমণীরা সেখানে আছে। অতএব··· ? সেই সব রমণীরা প্রবাল কিংবা পদ্মরাগ মণি সদৃশ। অতএব··· ? সেখানে দুটি উষ্ণ জলের প্রবাহ আছে। এতএব···? সেখানে অতি উত্তম ডালিম ও খেজুর আছে। অতএব ··· ? সমস্ত উদ্যানে পরিশুদ্ধ সুন্দরী রমণীরা রয়েছে। অতএব··· ? সেই সব গৌরবর্ণা সংযমী সুন্দরীরা চাঁদোয়ার নীচে অপেক্ষমানা। অতএব··· ? এর আগে কোনো মানুষ বা জিন তাদের স্পর্শ করেনি। অতএব··· ? সেখানে তাকিয়াতে ঠেস দিয়ে তারা সবুজ চাঁদোয়ার নীচে বসে আছে। অতএব··· ? এছাড়া সেখানে অতিকোমল বহুমূল্য শয্যাও রয়েছে। অতএব···।' (৫৫ : ৩ : ৪৬-৭৭)

১০. 'সেই সুখ সম্পদে পরিপূর্ণ উদ্যানে।···মুখোমুখী তাকিয়া হেলান দিয়ে বসে আছে। সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিরকিশোরের দল, রেকাবি, পেয়ালা এবং

ঘড়া নিয়ে। সেখানকার সুরাতে মাথা ঘোরে না কিংবা কোনো মত্ততা আসে না। ইচ্ছানুসারে উত্তম ফল। উড়ন্ত পাখীদের মাংস, রুচি অনুসারে। সুরক্ষিত মুক্তা সদৃশ বিশালনয়না সুন্দরীরা।...সেখানে মিথ্যা এবং পরস্পরের বিরুদ্ধে কানাকানি শুনবে না। শুধু শুনবে সালাম, সালাম (শান্তি, শান্তি)। ডানদিকে যারা আছে তারা কত ভাগ্যবান। তারা আছে কণ্টকশূন্য এক বদরিকা বৃক্ষের নীচে। প্রচুর কলার কাঁদি। প্রশস্ত, সম্প্রসারিত ছায়া। প্রবহমান জলস্রোত। অনেক উত্তম ফল, যাদের সুন্দর অটুট গড়ন এবং ভক্ষ্য হিসাবে নিষিদ্ধ নয়। উচ্চ শয্যা প্রস্তুত আছে। একই সময়ে সৃষ্ট, সমবয়স্কা কুমারীদের আমি ডানদিকেব লোকের জন্য তৈরি করেছি।' (৫৬ : ১ : ১২, ১৫-২৩, ২৪-৩১, ৩২-৩৮)

নরক

১১. 'মুক্তা খচিত স্বর্ণ কঙ্কণে আভূষিত হয়ে তারা বাসোদ্যানে প্রবেশ কববে, তাদের পরিধেয় বস্ত্র হবে রেশমী।' (৩৫ : ৪ : ৭)

উপরোক্ত বাক্যসমূহ থেকে কোরাণ প্রতিপাদিত স্বর্গ কি প্রকার, সে সম্বন্ধে অনুমান করা যায়। কোনো কোনো আধুনিক ব্যাখ্যাকারীদের মত এই যে জর্ডন নদীর তীরবর্তী সুজলা, সুফলা ইয়েমেন দেশে মুসলমানদের বিজয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী, কিন্তু এই ব্যাখ্যা প্রাচীন ভাষ্যকারদের দ্বারা স্বীকৃত নয়। এবং স্বর্গে যে সমস্ত বস্তুকে উপলব্ধ করা হয়েছে তা সেখানে সম্ভব। প্রকৃতপক্ষে ওই সমস্ত ব্যাখ্যাকারীরা সমস্ত অবস্থাকে বিংশ শতাব্দীর অনুকূলে আনতে চান। কিন্তু ওই সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণীকে বিংশ শতাব্দী বিশ্বাস করে কোথায়? বর্তমানে সামান্য কিছু নতুন বিচার ধারার অনুগামীদের বাদ দিলে, সমগ্র ইসলামী সমাজ উপরে বর্ণিত স্বর্গকেই স্বীকার করে। স্বর্গ, এমন একটি অদৃষ্ট বস্তু যা কল্পনারও সীমার বাইরে, সেখানে ঈশ্বরের অনুজ্ঞাই প্রমাণ।

স্বর্গে যেমন আনন্দসাগর সর্বদাই তরঙ্গায়িত, নরকে তেমনই বিপত্তির আগুন সর্বদাই ধিকি ধিকি জ্বলছে। কোরাণ শরীফে অনেক জায়গায় স্বর্গের বর্ণনার পাশাপাশি নরকের বর্ণনাও এসেছে। যেখানে পাপীদের পাপ কর্ম ত্যাগ করে শুভকর্মে উদ্বুদ্ধ হতে বলা হয়েছে যাতে তারা কেয়ামতের দিনে, নরকাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত না হয়। এখানে এবার কিছু নরক-প্রতিপাদক বাক্য উদ্ধৃত করা হলো।

১. 'সেই আগুনকে ভয় করো যার ইন্ধন মানুষ।' (২ : ৩ : ৪)

২. 'যারা আমার প্রমাণে বিশ্বাস করেনি, কিছুক্ষণ পরই আমি তাদের আগুনে নিক্ষেপ করব। যখন তাদের এক পরত ত্বক দগ্ধ হবে তখন আমি আবার তা বদলে দেবো, যাতে তারা যন্ত্রণার আস্বাদ পায়।' (৪ : ৮ : ৬)

৩. 'তারপর তাদের নরকে গলিত ক্ষত-ধৌত জল পান করানো হবে। এক এক ঢোঁক মুখে নেবে কিন্তু গলধঃকরণ করতে পারবে না। তার কাছে মৃত্যু এলেও

মরণ হবে না। তার পৃষ্ঠদেশে লগুড়াঘাত বর্ষিত হবে।' (১৪ : ৩ : ৪,৫)

৪. 'সেই সমস্ত শয়তান অনুগামীদের নরকের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। নরকের সাতটি দ্বার এবং প্রত্যেক দ্বারের কাছেই এক একটি দলকে রাখা হয়েছে।' (১৫ : ৩ : ১৯)

৫. 'তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করো। অতঃপর একশো চল্লিশ হাত দীর্ঘ শৃঙ্খলে বাঁধো। সে মহান্ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না। দরিদ্রকে আহার্য দানে ইষ্টচিত্ত ছিল না। এখানে সে নিজে ছাড়া তার কোনো বন্ধু নেই। ক্ষত ধৌত জল ছাড়া তার কোনো আহার্য বা পানীয় নেই। অপরাধী না হলে যা কেউ গ্রহণ করে না।' (৬৯ : ২ : ২৮-৩৪)

৬ 'স্বর্গে, স্বর্গবাসী ব্যক্তিরা প্রশ্ন করে, হে পাপীগণ। তোমরা কি নরকে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ? তারা বলে, আমরা না ছিলাম নমাজী, না দিতাম দরিদ্রকে আহায। আমরা কেয়ামতের দিনকে মিথ্যা মনে করার দলে ছিলাম। ইতিমধ্যে বিশ্বাসনীয় মৃত্যু আমাদের কাছে চলে আসে। অতঃপর সুপারিশকারীদের সুপারিশ কোনো কাজে আসে না।' (৭৪ : ২ : ৯ : ১০, ১২-১৪, ১৬-১৮)

৭. 'আর উত্তর দিকের লোকেরা, (উত্তরদিকের লোক নারকী এবং দক্ষিণের লোক স্বর্গবাসী) তারা যন্ত্রণার মধ্যে, তাদের ওপরে উত্তপ্ত বারিধারা বর্ষিত হবে, ধোঁয়ার আচ্ছাদনের মধ্যে তারা থাকবে, যা শীতলও নয় স্থিরও নয়। তারা জকুম বৃক্ষ (আরব দেশের এক বৃক্ষ যা অত্যন্ত কটু এবং বিস্বাদ) আহার করবে। তা দিয়েই তারা উদরপূর্তি করবে। তদুপরি তারা উষ্ণজল পান করবে।' (৫৬ : ২ : ২-৫, ১৩-১৫)

৮. 'কাফিরদের জন্য আগ্নেয় বস্ত্র নির্মিত হয়েছে। তাদের মাথার ওপরে গরমজল ঢালা হবে। তার ফলে যা তাদের উদরে আছে এবং তাদের ত্বক সহ সব কিছুই প্রবাহিত হয়ে যাবে। তাদের জন্য লৌহ মুদগর রয়েছে, কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে বাইরে বার হয়ে আসতে চাইলেও তাকে বলপূর্বক ভিতরে করে দেওয়া হবে। ভোগ করো নরক যন্ত্রণা।'

স্বর্গ নরক মুখোমুখী

৯. 'নরকের বাসিন্দারা স্বর্গের বাসিন্দাদের উদ্দেশ্য করে বলে, আমাদের জন্য কিছু জল এবং মহান্ ঈশ্বর যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন তা থেকে কিছু আমাদের দান করো। স্বর্গবাসীরা বলে, ঈশ্বর উভয়ই নাস্তিকদের জন্য অবৈধ করেছেন।' (৭ : ৬ : ৩)

উপরোক্ত বাক্য আমাদের স্বর্গের রমণীয়তা এবং নরকের ভীষণতার সঙ্গে পরিচিত করায়। স্বর্গ এবং নরক, উভয়ের উপভোগই অনন্তকাল ধরে চলে, তবে কখনো কখনো তার সময়কাল ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হয়ে থাকে। যেমন—

'যারা পুণ্যাচরণ করেছে, যতক্ষণ আকাশ ও পৃথিবী বর্তমান, তারা স্বর্গবাসী হবে, তবে যদি তোমার প্রভু ইচ্ছা করেন। তোমাদের প্রভুর কৃপা অসীম।'
(১১ : ৯ : ১৩)

'যারা পাপ আচরণ করেছে, নরকাগ্নি তাদের জন্য, সেখানে শুধু চিৎকার ও আর্তনাদ। যতদিন আকাশ ও পৃথিবী বর্তমান ততদিন তারা সেখানে থাকবে, তবে তোমার প্রভু যদি অন্যরূপ ইচ্ছা করেন। ঈশ্বর যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।' (১১ : ৯ : ১১, ১২)

দ্বিতীয় উদাহরণটিকে নিয়ে বহুলোক নরককে সীমিত এবং স্বর্গকে অনন্ত মনে করে। তবে উভয় বাক্য দেখলে দুই জায়গা সম্বন্ধে একইভাব প্রতীত হয়েছে বলে মনে হয়।

এরাফ

স্বর্গ এবং নরকের অধিবাসীদের মধ্যে সংলাপের বিনিময় আমরা কোরাণ বাক্যতে ইতিপূর্বে পেয়েছি। সেজন্যই মনে হয় উভয় স্থানই পাশাপাশি অবস্থিত। নরক উত্তর দিকে এবং স্বর্গ দক্ষিণ দিকে, সেই জন্য দু' জায়গার নিবাসীদের যথাক্রমে উত্তরী এবং দক্ষিণী বলা হয়েছে। উভয়ের মধ্যে এক প্রাচীর রয়েছে। কোরাণ শরীফে বলা হয়েছে—

'উভয়ের মধ্যে এক প্রাচীর রয়েছে, যার ওপরে অনেক লোক বসে, যারা একে অপরকে সাদৃশ্যের সাহায্যে চেনে। তারা স্বর্গীয়দের বলে—তোমাদের জন্য সালাম। এরা স্বর্গে প্রবিষ্ট হয়নি কিন্তু হতে ইচ্ছুক। অতঃপর নারকীদের ওপরে তাদের দৃষ্টি পড়ে এবং বলে, হে আমাদের প্রভু, আমাদের অপরাধীদের সঙ্গে রেখো না।' (৭ : ৫ : ৭, ৮)

এই মধ্যবর্তী প্রাচীরের নামই এরাফ এবং এখানে যারা অবস্থান করে তাদের অস্‌হাবী-ইঅ্‌রাফ বা এরাফবাসী বলে, এরা স্বর্গ কিংবা নরক কোনোটিকেই ভোগ করার উপযুক্ততা অর্জন না করার কারণে এখানেই বাস করে।

স্বর্গ এবং নরক উভয় স্থানের ভোগ কর্মফলের ওপরে নির্ভর করে—এ কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কর্মভোগের জন্য জীব অন্যের মুখাপেক্ষী, কিন্তু কোরাণ শরীফে এমন অনেক বাক্য আছে যাতে জীবের কর্ম করার মধ্যেও পর নির্ভর-শীলতার ঝলক দেখা যায়। যথা—

পুনর্জন্ম

'ঈশ্বর যাকে সঠিক পথে চলার প্রেরণা দেন, 'সে সঠিক পথগামী হয়, যাকে পথভ্রষ্ট করেন সে বিপথগামী হয়ে থাকে।' (৭ : ২২ : ৭)

'ঈশ্বর তাদের (কাফিরদের) হৃদয়ে, তাদের কানে শীলমোহর করে দিয়েছেন, তাদের চোখের সামনে ভারি পর্দা, তাদের জন্য শুধু যন্ত্রণাই রয়েছে।' (২ : ১—)

'তাদের হৃদয় রোগগ্রস্ত, ঈশ্বর তাকে আরও বর্ধিত করেন।' (২ : ১—)

'ঈশ্বর যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথে চালনা করেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন পথভ্রষ্ট করেন।'

মৃত্যুও ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন।—

'কোনো জীবই ঈশ্বরের আদেশে লিখিত সময়ের পূর্বে মরে না।' (৩ : ১৫ : ২)

একস্থানে এরকমও বলা হয়েছে—

'যারা তাঁর (ঈশ্বরের) ইচ্ছা অনুসরণ করে, প্রভু তাদের শান্তির পথ নির্দেশ করেন। তিনি তাঁর আদেশে মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে প্রেরণ করেন, তাদের সরল এবং সত্য পথে চালনা করেন।' (৫ : ৩ : ৫)

ভারতবর্ষে উদ্ভূত ধর্মগুলি (জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম) যেরকমভাবে অন্যায় কর্মদোষের জন্য বার বার জন্মগ্রহণকে স্বীকার করেছে, ইসলাম সেভাবে পুনর্জন্মকে স্বীকার না করলেও ইসলামের মধ্যে এমন কিছু সম্প্রদায় আছে যারা পুনর্জন্ম স্বীকার করে। বিশ্ববিখ্যাত কবি, দার্শনিক মহাত্মা রুমী তাঁর মস্নূইতে লিখেছেন—

'হম্ চুঁ সব্জা বারহা রোইদ অম্।
হপ্ত সদ্ হপ্তাদ কালিব দীদ অম্॥
(আমি নবসত্যবৎ কতবার জন্ম নিয়েছি।
সাতশত সত্তর শরীর দেখেছি॥)

এই সিদ্ধান্তকে যারা মানেন, তাঁরা কোরাণের এই বাক্যকে সাক্ষী রূপে উপস্থিত করেন—

'যার ওপরে ঈশ্বর কুপিত হন, তাদের মধ্যে কাউকে বানর এবং কাউকে শুকরে পরিবর্তিত করে দেন।' (৫ : ৯ : ৪), (৭ : ২১ : ৩)

এখানে এক প্রাচীন জাতির পাপী লোকেরা ঈশ্বরের কোপে পশুতে পরিণত হয়েছিল সে কথা বলা হয়েছে।

জীবের কর্ম অনুসারে স্বর্গ ও নরকের বিধান সম্বন্ধে আলোচনার পর কোরাণের অন্যান্য সিদ্ধান্তগুলির আলোচনা করা হবে।

অষ্টম বিন্দু

ধার্মিক কর্তব্য

'রজ্বৈতু লকুমুল্-ইসলাম দীন।' (তোমাদের জন্য আমি ইসলামকে) 'দীন' হিসাবে মনোনীত করেছি। (৫ : ১ : ৩)

'ইসলাম ধর্ম ঈশ্বরের পক্ষ থেকে এসেছে।' (৩ : ২ : ১০)

'ইসলামে সম্পূর্ণরূপে প্রবিষ্ট হও।' (২ : ২৫ : ১২)

উপরোক্ত বাক্যের মাধ্যমে কোরাণ প্রতিপাদিত ধর্মের নাম বলা হয়েছে ইসলাম। ইসলাম শব্দের অর্থ—শান্তি অথবা শান্তিক্রিয়া। ইসলামকে যারা মানেন তাদের মুসলিম বলা হয়, বহুবচনে মুসলমান। যদিও আরবী ভাষার রীতি অনুসারে 'মুসলমান' শব্দটি বহুবচন নয় দ্বিবচন। ভারতবর্ষে মুসলমান আমলেই ফারসী ভাষার বহুল প্রচলন হয়। সেইজন্য ফারসীর বহুবচন সূচীত করে 'আন' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এই শব্দটিকেও বহুবচন মনে করা হয়। ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'যারা ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্মকে স্বীকার করেছে, কদাপি তারা স্বীকৃতি পাবে না এবং কেয়ামতের দিনে তারা লোকসানের সম্মুখীন হবে।' (৩ : ৮৫)

এখানে যদি ইসলাম ধর্মকে শান্তি-ধর্ম মনে করা হয়, তাহলে তার সত্যতাতে কোনো সন্দেহ থাকা অনুচিত। দ্বিতীয় বিন্দুতে আমরা লিখেছি যে বিশ্বের সমস্ত ঋষিদের বাক্যকেই ইসলাম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখেছে। অতঃপর তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা থাকা তার যোগ্য নয়, কিন্তু এই তথ্যকে বোঝার জন্য খুব কম চেষ্টাই করা হয়েছে।

ইসলামের সিদ্ধান্ত

আরবী 'মজহব' এবং 'দীন' শব্দ যে অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে, তাকে ইংরেজির **Religion** শব্দ অবশ্যই ব্যক্ত করে, কিন্তু সংস্কৃত অথবা হিন্দীতে তার পর্যায়বাচী কোনো শব্দ পাওয়া যায় না। যদিও 'পন্থ' শব্দটি 'মজহব' শব্দের যথার্থ ধাতুগত অর্থকে ব্যাখ্যা করে, কিন্তু ধর্ম শব্দটি যেমন অতিব্যপ্ত, সেই দৃষ্টিতে শব্দটি স্বল্প ব্যাপ্তির দোষ বহন করে। যে পথ মানুষকে ঐহিক এবং আধ্যাত্মিক শ্রেয়ত্ব প্রাপ্তির দিকে নিরন্তর নিয়ে চলে, সেটাই ইসলাম পন্থ, ধর্ম বা সম্প্রদায়। বোঝার জন্য আমরা 'পন্থ' শব্দটিকেই এর জন্য ব্যবহার করব। প্রত্যেক পন্থে দুই ধরনের মন্তব্য থাকে। একটি বিশ্বাসাত্মক এবং আরেকটি ক্রিয়াত্মক। নীচে এই দুই ধরনের মন্তব্যকেই কোরাণ শরীফের ভাষ্যে উদ্ধৃত করা হলো—

'তুমি তোমার মুখকে পূর্ব অথবা পশ্চিমের দিকে ফেরালে তাতে পুণ্য নেই। পুণ্য হলো—ঈশ্বর, অন্তিম দিন (কেয়ামত), ফেরেস্তাগণ, পবিত্র গ্রন্থ এবং প্রাচীন নবীগণের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা। ধন সম্পদকে প্রেমিক, আত্মীয় সম্বন্ধী, অনাথ, দরিদ্র, পথিক, ভিক্ষুক এবং দাসত্বমোচনের জন্য ব্যয় করা। উপবাস (রোজা) রাখা, দান করা, প্রতিজ্ঞা করলে তা পালন করা, বিপত্তিতে, ক্ষতিতে এবং যুদ্ধে সহিষ্ণু থাকা। যারা এরকম করে তারা সত্যপরায়ণ এবং সংযমী।'

(২ : ২২ : ১)

ভ্রাতৃভাব

অন্যত্র বিশ্বাসাত্মক সিদ্ধান্তকে আরও স্পষ্ট করা হয়েছে—

'হে বিশ্বাসীগণ (মুসলমান)! ঈশ্বর, তাঁর প্রেরিত এবং যে গ্রন্থ তাঁর প্রেরিতের প্রতি বর্তমানে এবং অতীতেও অবতীর্ণ হয়েছে, সেই সমস্ত কিছুর প্রতি বিশ্বাস রাখো। যে ঈশ্বর, তাঁর দূত, তাঁর গ্রন্থ, তাঁর প্রেরিত (রসুল) এবং অন্তিম দিনে বিশ্বাস করে না, সে সত্য থেকে বহু দূরে এক পথভ্রান্ত। (৪ : ২০ : ২)

যেভাবে উপরোক্ত বাক্যে পূর্ব পশ্চিমে মুখ ফেরানর মধ্যে ধর্ম অবস্থান করে না ভেবে বিশ্বাস এবং অন্যান্য সৎকর্মের প্রতি জোর দেওয়া হয়েছে, ঠিক সেইভাবে নীচের বাক্যে শুধুমাত্র বিশ্বাসকে পর্যাপ্ত না মনে করে শুভ কর্ম করার বিধান দেওয়া হয়েছে—

'নিসন্দেহে যারা বিশ্বাস করেছে এবং উত্তম কাজ করেছে, প্রার্থনা (নমাজ) জারি রেখেছে, দান দিয়েছে, ঈশ্বর তাদের যোগ্য প্রতিফল দেবেন। তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা কখনও শোকাকুল হবে না।' (২ : ৩৮ : ৪)

দান ধর্ম সম্বন্ধে এক জায়গায় বলা হয়েছে—

'যতক্ষণ পর্যন্ত আপন প্রিয় বস্তু থেকে ব্যয় না করো, ততক্ষণ পর্যন্ত পুণ্যকে পেতে পারো না।' (৩ : ১০ : ১)

উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ছাড়া অতিরিক্ত আরেকটি বিষয় আছে, যাকে ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করে, তা হলো ভ্রাতৃভাব।

'অবশ্যই সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই। অতঃপর দুই পরস্পর যুদ্ধরত ভাইদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করো। ঈশ্বরকে ভয় করো, যাতে তাঁর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।'

(৪৯ : ১ : ১০)

ইসলামের ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে তারা তাদের ভ্রাতৃভাবের প্রতিশ্রুতিকে বহুল পরিমাণে পালন করেছে। স্বয়ং মহাত্মা মুহম্মদ তাঁর পিতৃস্বসার কন্যার সঙ্গে একদা ক্রীতদাস জৈদের বিবাহ দেন। আজও পর্যন্ত পৃথিবীতে হাবসীদের যথেষ্ট নীচু চোখে দেখা হয়, সেই জাতিরই একজন হলেন বলাল, যিনি মহাত্মা মুহম্মদের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন. এবং তাঁকে ইসলামের প্রতিষ্ঠিত পিতামহদের একজন

বলে গণ্য করা হয়। ভারতবর্ষেই দাস কুতবউদ্দীনকে মুহম্মদ ঘোরী কত উচ্চাসনে আসীন করেছিল। তবে উঁচু নীচু জাতি বিভাজনে পরিপূর্ণ ভারতবর্ষে এসে মুসলমানেরা নিজেদের সেই ভ্রাতৃভাব ততটা আর রক্ষা করতে পারেনি। এদেশের অনেক আচার ব্যবহারের সঙ্গে জাতপাত, উচ্চ নীচ ইত্যাদি বিচারও তাদের মধ্যে প্রবেশ করে। কে বলতে পারে যে এই ধরনের ভাব পরিবর্তনের কারণেই তারা হীনবল হয়ে পড়েনি।

যদিও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে কোরাণ অভিপ্রেত ভ্রাতৃভাব দেখা যায় না। তবুও এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃভাব দেখা যায় তা অন্যদের মধ্যে দেখা যায় না। জাপান, ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত ইত্যাদি দেশের বৌদ্ধরা, ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে সেই বন্ধনেই আবদ্ধ, যে বন্ধনে ভারতীয় মুসলমানেরা অন্য দেশের মুসলমানদের সঙ্গে আবদ্ধ। কিন্তু সেই ভ্রাতৃভাব বা ভালোবাসা কি ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে দেখা যায় যা কাবুল, তুর্কীস্থান, আরব এবং ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যায়? ভারতীয় হিন্দুরা কি রুশ-জাপান যুদ্ধে, জাপানের প্রতি সেই সহমর্মীতা দেখিয়েছে, যা মুসলমানেরা তাদের ধর্মভাই তুর্কদের প্রতি দেখিয়েছে? বস্তুত প্রেম জীবনের উপলব্ধির মধ্যে নিহিত থাকে, কোনো নির্জীব ব্যক্তি কিংবা মূর্ছিত জাতির মধ্যে তার দেখা পাওয়া অসম্ভব। ভারতের বাইরে দূরদেশে বসবাসকারী বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বন্ধুদের হৃদয়ে পবিত্র ভারতের প্রতি—যেখানে করুণাময় গৌতমের চরণধূলি আজও বিদ্যমান—সেই রকমই ভালোবাসা বর্তমান যা ভারতীয় মুসলমানদের রয়েছে আরব দেশের প্রতি। সহস্র ক্রোশ পথ পাড়ি দিয়ে, সমুদ্র, পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করে আগত সেই সব তীর্থযাত্রীর দল, যারা নিজের চোখে উরবিল্ব (বোধগয়া), ঋষিপত্তন-মৃগদার (সারনাথ, বারানসী), কুশীনগর (কসয়া, গোরখপুর), লুম্বিনী (রুম্মিনদেঈ, তরাই নেপাল) এবং জেতবন (সহেট-মহেট, বাহরাইচ) দেখতে সহস্রের সংখ্যায় প্রতি বছর আসে, তারা অবশ্যই সেই ভ্রাতৃভাবের সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু ভারতীয় হিন্দুরা কি তাদের দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল করে? তাদের মধ্যে অধিকাংশের তো এই ধারণাই নেই যে তাদের পঞ্চাশ-ষাট কোটি ধর্মভাই ভারতবর্ষের বাইরে বসবাস করে যারা আমাদেরই মতো আর্য ধর্ম এবং আর্য সভ্যতার অনুরাগী। তাদের কাছে বুদ্ধগয়ার মতো স্থান পৃথিবীতে কোথাও নেই। যে বোধিবৃক্ষের নীচে প্রণাম করে হিন্দু তার সমস্ত পিতৃপুরুষকে মুক্ত করে, সেই বোধিবৃক্ষের জন্য পৃথিবীর সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং গৃহস্থরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত শ্লোক পাঠ করে ও মাথা নত করে—

কর্তব্য কর্ম

যস্স মূলে নিসিন্নো বে সব্বারি বিজয়ং অকা।
পত্তো সব্বঞ্ঞতাং সথা বন্দে তং বোধি-পাদপম্ ॥
যার মূলে উপবেশন করে সর্বারির* ওপরে বিজয়ী হয়েছেন।
প্রভু সর্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয়েছেন, সেই বোধিবৃক্ষকে বন্দনা করি ॥

(*এখানে সর্বারি অর্থে সকলের শত্রু, কাম-মার ইত্যাদি।)

ধার্মিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধন এত দৃঢ় হওয়া সত্ত্বেও হিন্দুদের বাইরের বৌদ্ধ জগতের সঙ্গে যে রকম উদাসীন সম্পর্ক তাতে আশ্চর্য হতেই হয়।

সংক্ষেপে ইসলামের চারটি ধর্মস্কন্ধ বর্তমান—সোম (রমজান মাসে রোজা বা উপবাস পালন), সলাত (প্রার্থনা বা নমাজ) হজ (কাবা যাত্রা) এবং জাকাত (দান)। এই প্রধান কর্মের পূর্তির জন্য কোরবানি (বলিদান) একটি অঙ্গ কর্ম।

হিন্দু ধর্মেও সিদ্ধান্ত দুই ধরনের একটি ক্রিয়াত্মক, আরেকটি বিচারাত্মক। উপরোক্ত চারটি বিষয় ইসলামের ক্রিয়াত্মক সিদ্ধান্ত। হিন্দুদের শাস্ত্র গ্রন্থে যেভাবে আপৎকাল, অনাপৎকাল; দেশ এবং ব্যক্তি অনুসারে কঠিন বিধানকে সরল, সহজ করা হয়েছে কিংবা প্রয়োজনে একেবারে পরিত্যাগ করার বিধানও দেওয়া আছে, ইসলামেও তদনুরূপ ব্যবস্থা রয়েছে। হিন্দু ধর্মে যেমন শ্রুতি, স্মৃতি এবং শিষ্টাচারকে প্রমাণ হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে, ঠিক তেমনভাবে ইসলাম, কোরাণ, হাদীস এবং রসুল মুহম্মদ ও অন্যান্য মহাপুরুষদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান দ্বারা প্রমাণভূত। যেমন পরস্পর বিরোধী হলে স্মৃতি শিষ্টাচারের চেয়ে বলবতী এবং শ্রুতি স্মৃতি অপেক্ষা বলবতী এবং স্বতঃপ্রমাণ, যার এক একটি শব্দ প্রমাণভূত, কিন্তু স্মৃতি শ্রুতির প্রতিকূল না হলে তা একটি প্রমাণ। ঠিক সেইভাবে কোরাণ স্বতঃপ্রমাণ, তবে হাদীস তার প্রতিকূল না হলে, এবং শিষ্টাচার উভয়ের বিরোধী না হলে, প্রমাণ হিসাবে স্বীকৃত। মীমাংসকদের মতো ইসলামের ফিক্রাবেত্তারা এই বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। কোরাণ শরীফে যেখানে কোথাও দুটি পরস্পর বিরোধী বিধানের উল্লেখ আছে সেখানে একটিকে বিকল্প ধরে নিতে হবে কারণ কোরাণ শরীফ ঈশ্বরের তরফ থেকে অবতীর্ণ হওয়ার ফলে যথার্থ বিরোধ সেখানে কোথাও আছে একথা স্বীকৃত নয়। স্বয়ং কোরাণ শরীফে বলা হয়েছে—

ধর্মে প্রমাণ

'তারা কি কোরাণ অনুধাবন করে না। যদি ঈশ্বর ব্যতীত আর কারও পক্ষ থেকে আগত হতো তাহলে অবশ্যই তাতে অনেক বেশী (পরস্পর) বিরোধিতা থাকত।' (৪ : ১১ : ৫)

শ্রুতি-প্রতিপাদিত আজ্ঞার মতো কোরাণের আজ্ঞাও অনিবার্য। কিন্তু

হাদীসের সমস্ত বিধান সম্বন্ধে ইসলামের সমস্ত সম্প্রদায় একমত নয়। ইসলামে বলা হয়েছে শিষ্টাচারের মধ্যে মহাত্মা মুহম্মদের আচরণই সর্বশ্রেষ্ঠ। কোরাণে বলা হয়েছে—

'নিঃসন্দেহ, প্রভু-প্রেরিত পবিত্র আচরণ তোমার জন্য অনুকরণীয়।

(৩৩ : ২ : ১)

কোরাণ প্রতিপাদিত ধর্মবিধি ব্যতিরেকে হাদীস এবং শিষ্টাচার দ্বারা প্রতিপাদিত ধর্মবিধির বিষয়ে সমস্ত মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যমত্য না থাকায় আমরা আলোচ্য গ্রন্থে কোরাণ শরীফকেই আশ্রয় করেছি।

কর্মকাণ্ড (রোজা, উপবাস)

'হে বিশ্বাসীগণ (মুসলমান)! পূর্বজদের মতো তোমাদের প্রতিও কিছুদিনের জন্য উপবাস পালনের বিধান লেখা হয়েছে, যাতে তোমরা সংযমী হও। অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ে কিংবা ভ্রমণের মধ্যে থাকে তাহলে তারা রোজার পরিবর্তে একটি দরিদ্রকে আহার্য দেবে। যে আপন ইচ্ছায় শুভকর্ম করে তার সর্বদাই মঙ্গল হয় আর যদি উপবাস পালন করে তাহলে তার পক্ষে আরও শুভ, যদি তুমি এ বিষয়ে জ্ঞাত থাকো।

'রমজানের মাস পবিত্র, যে মাসে স্পষ্ট, পথ প্রদর্শক, মানব শিক্ষক, সত্যাসত্য বিভাজক, পবিত্র কোরাণ অবতীর্ণ হয়েছিল। এজন্য তোমাদের মধ্যে যারা রমজান মাসকে পাবে তারা যেন উপবাস করে।' (২ : ২৩ : ১-৩)

এখানে রমজান মাসে উপবাসের বিধান দেওয়া হয়েছে তবে একথাও বলা হয়েছে যে রোগী এবং যাত্রীদের এই অবস্থায় কি করা উচিত।

নমাজ

নমাজ (সলাত, প্রার্থনা)—প্রত্যেক মুসলমানের এটি একটি নিত্য কর্তব্য। যা না করলে তারা পাপ-ভাগী হয়। বলা হয়েছে—

'সলাত এবং মধ্য-সলাতের জন্য সাবধান হও। নম্রতার সঙ্গে ঈশ্বরের জন্য দণ্ডায়মান হও। যদি বিপদগ্রস্ত হয়ে থাকো পদাতিক কিংবা সওয়ারী অবস্থাতেই তাকে পূরণ করো। পুনরায় যখন সব কিছু শান্ত হয়ে যাবে···তখন প্রভুকে স্মরণ করো।' (৩ : ৩২ : ৩-৪)

ইসলামে নমাজের স্থান অত্যন্ত প্রধান। এর সঙ্গে হিন্দুদের সন্ধ্যা কিংবা ব্রহ্ম যজ্ঞের তুলনা করা যায়। যদিও কোরাণ শরীফে পাঁচ ওয়াক্তের নমাজের বর্ণনা কোথাও আসেনি, তা সত্ত্বেও এ একপ্রকার সর্বমান্য। পাঁচ ওয়াক্ত বা সময়ের নমাজ—

(১) 'সলাতুল্‌ফজ্র' (প্রাতঃ প্রার্থনা) যা উষাকালে করতে হয়।

(২) 'সলাতু-জ্জোহ্র'—(মধ্যাহ্নোত্তোর তৃতীয় প্রহর-আরম্ভিক প্রার্থনা) যা দ্বিপ্রহরের পর তৃতীয় প্রহরের প্রারম্ভে হয়ে থাকে।

(৩) 'সলাতুল্ অস্র' (মধ্যাহ্নোত্তোর চতুর্থ প্রহরারম্ভিক প্রার্থনা) এটি চতুর্থ প্রহর আরম্ভের সময় করতে হয়।

(৪) 'সলাতুল্-মগ্রিব' (সান্ধ্য প্রার্থনা) সূর্যাস্তের পরেই এটি করতে হয়।

(৫) 'সলাতুল-ইষা' (রাত্রির প্রথম যামের প্রার্থনা) রাত্রির প্রথম প্রহরের অন্তিমে এই প্রার্থনা (নমাজ) অনুষ্ঠিত হয়।

এ ছাড়াও শ্রদ্ধালু মানুষ 'সলাতুল্লৈল' (নিশীথ-প্রার্থনা) এবং 'সলাতুজ্জুহা' (দিবা প্রথম যামের প্রার্থনা) করে থাকেন। যা ক্রমশ রাত্রির চতুর্থ প্রহর থেকে আরম্ভ হয়ে দিনের প্রথম প্রহর পর্যন্ত চলে।

নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়ার আগে প্রথমে বিভিন্ন ক্রমানুসারে 'ওজু' (অঙ্গ-শুদ্ধি) করে নিতে হয়।

(১) দুই হাত ধোওয়া

(২) জল দিয়ে মুখ প্রক্ষালন করা

(৩) জল দিয়ে নাকের অভ্যন্তরীণ অংশ ধোওয়া

(৪) মুখমণ্ডল ধোওয়া

(৫) কনুই পর্যন্ত হাত ধোওয়া

(৬) দুই ভেজা হাত একত্রিত করে তর্জনী, মধ্যমা এবং অনামিকার সাহায্যে মাথা মোছা।

(৭) গোড়ালি পর্যন্ত পা ধোওয়া। প্রথমে ডান পা পরে বাঁ পা। শুয়ে পড়লে কিংবা প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিলে আবার ওজু করতে হয়, না হলে একবার ওজু করলেই যথেষ্ট। মৈথুনের পর শুধুমাত্র ওজু করলেই কাজ হবে না, তখন সম্পূর্ণ স্নান করতে হয়। জল উপলব্ধ না হলে কিংবা অসুস্থ হলে শুদ্ধ শুকনো মাটি হাতে লাগিয়ে মাথা, মুখ এবং করপৃষ্ঠে বুলিয়ে নিতে হয়। এই প্রথাকে আরবীতে বলে তয়ম্মুম্। শুদ্ধির বিষয়ে কোরাণ শরীফ এরকম বলছে—

'হে বিশ্বাসীগণ (মুসলমান)! তোমরা মত্ত অবস্থাতে নমাজের জায়গায় এসো না। কারণ নমাজের সময়ে যা কিছু তোমরা বলো তাকে বুঝতে পারবে না। তাছাড়া যদি অপবিত্র থাকো, যাত্রার মধ্যে কিংবা অসুস্থ থাকো, তাহলেও স্নান না করে নমাজে উপস্থিত হয়ো না, তোমাদের মধ্যে যারা প্রাকৃতিক কর্মে নিযুক্ত ছিল কিংবা স্ত্রী-সংসর্গে লিপ্ত ছিল তারা সকলেই যেন নমাজে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে সম্পূর্ণ স্নান করে। যদি জল না পাওয়া যায় তাহলে শুদ্ধ শুষ্ক মাটি নিয়ে হাতে মুখে লাগাও।' (৪ : ৭ : ১)

নমাজ দুই ধরনের, যাকে 'ফর্দ' (ব্যক্তিগত) এবং 'সুন্নত' (সামূহিক) বলা হয়। ইমাম (যিনি অগ্রণী হয়ে নমাজ পড়ান)-এর পিছনে যারা নমাজ পড়ে

সেই ভাগকে সুন্নত বলে এবং যারা জমায়েতে নমাজ পাঠ না করে একাকী পাঠ করে তাদের ফর্দ বলে। জমায়েতে যদি কেউ সামূহিক নমাজ পড়তে অসমর্থ হয়, তার সুন্নতও ফর্দ হয়ে যায়। প্রত্যেক নমাজ কয়েকটি রাকাতের ওপরে নির্ভর করে। যতটা জপ করে একবার মাটিতে মাথা ঠেকানো হয় তাকে রাকাত বলে।

(১) ভোরের নামাজে দুটি সামূহিক এবং দুটি একক রাকাত থাকে।

(২) দ্বিপ্রহরের নমাজ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হয়ে থাকে। তার মধ্যে প্রথম চারটি অথবা ছটি রাকাত একক, মধ্যে চারটি রাকাত সামূহিক এবং অন্তিমে দুটি একক রাকাত জপ করা হয়। শুক্রবার দিনের সাপ্তাহিক বড নমাজ এই সময়েই অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এতে চারটি সামূহিক রাকাতের পরিবর্তে দুটি রাকাত পড়া হয় এবং বাকী দুটির বদলে ইমামের খুত্‌বা বা উপদেশ হয়ে থাকে, যাকে লোক সাবধানতার সঙ্গে শোনে।

(৩) দ্বিপ্রহর অন্তের নামাজের চারটি রাকাতই সামূহিক।

(৪) সান্ধ্য নমাজে তিনটি রাকাত একক পডার পর দুটি সামূহিক রাকাত পডা হয়।

(৫) রাত্রির প্রথম প্রহরের নমাজে চারটি রাকাত একক, পুনরায় দুটি রাকাত সামূহিক, অতঃপর 'চিত্র' নামের তিনটি রাকাত একক পডা হয়।

নিশীথ প্রার্থনার আটটি রাকাত একক হয়ে থাকে।

প্রভাতের প্রথম প্রহরের নমাজেও দুটি অথবা চারটি রাকাত একক হয়ে থাকে।

ঈদের নমাজ—যা বছরে একবারই পড়া হয়—তাতে দুটি সামূহিক রাকাতের পর খুত্‌বা অথবা উপদেশ হয়ে থাকে।

যাত্রাকালে প্রভাতের নমাজ বাদে সমস্ত নমাজেই সামূহিক রাকাতও একক হয়ে যায়। এবং দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চমের চারটি রাকাত-এর মধ্যে দুটি একক রাকাত থেকে যায়। যদি ভ্রমণকাল একটানা তিন দিনের অধিক হয়, তাহলে সব নমাজই পড়া উচিত। যদি দুই বা তার বেশী নমাজ পাঠের লোক থাকে, তাহলে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে অগ্রণী (ইমাম) নির্বাচিত করে তার পরিচালনায় নমাজ পড়া উচিত।

নীচে নমাজে পাঠ করা হয় এমন আরবী বাক্য উদ্ধৃত করা হলো।

নমাজের সময় সূচনা ঘোষণা করে যে ব্যক্তি তাকে বলা হয় মুয়াজ্জিন—সে কাবার দিকে মুখ করে উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করে, যাকে বলা হয় আজান বা আহ্বান—

১. 'অল্লাহু অক্‌বর', (এই শব্দকে বলা হয় 'তক্‌বীর তহীম' অর্থাৎ পবিত্র মাহাত্ম্য উচ্চারণ) উক্ত শব্দের অর্থ ঈশ্বর অত্যন্ত মহান্‌। [চারবার এই বাক্য উচ্চারিত হয়।]

২. 'অশহদো অল্লা-ইলাহ-ইল্লল্লাহ।' (আমি সাক্ষী দিচ্ছি যে, ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ পূজ্য নেই।) [দুই বার]

৩. 'অশ্‌হদো অন্ন মুহম্মদন্ রসূলল্লাহি'। (সাক্ষী দিচ্ছি যে, মুহম্মদ ঈশ্বরের দূত।) [দুই বার]

৪. 'হয্যা-অল স্‌সলাত্' (নমাজে এসো) [ডানদিকে মুখ করে দুবার]

৫. 'হয্য অলল্-ফলাহ।' (মঙ্গলের দিকে এসো।) [বাঁদিকে মুখ করে দুবার]

৬. 'অল্লাহু অক্‌বর।' [দুই বার]

৭. 'লা ইলাহ ইল্ল-ল্লাহ।' (ঈশ্বর ব্যতীত আর কোনো পূজ্য নেই)

প্রভাতের নমাজে পাঁচ নম্বর আহ্বানের পর এই বাক্য বলা হয় 'অস্‌সলাতো খৈরুন মিনন্নোম' (নমাজ নিদ্রার চেয়ে শ্রেষ্ঠ) [দুই বার]

নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হওয়াকে ইকামত বলা হয়। ইকামতে প্রথম থেকে পঞ্চম বাক্যকে এক একবার উচ্চারণ করার পর একে দুবার পড়া হয়—

'কদ্ কামতিস্‌সলাত' (নমাজ আরম্ভ হয়েছে)। ঈদের নমাজে আজান এবং ইকামতের পরিবর্তে প্রথম আহ্বানটিকেই সাতবার প্রথম রাকাতে পড়া হয়, এবং দ্বিতীয় রাকাত—পবিত্র মাহাত্ম্যোচ্চারণের পরে তাকে পাঁচবার জপ করা হয়। শুক্রবারের নমাজে দুবার আজান হয়। দ্বিতীয় আজানটি ইমামের খুত্‌বা আরম্ভের প্রাক্কালে তার সূচনার জন্য দেওয়া হয়।

১. কাবার দিকে মুখ করে, দুই হাত কান পর্যন্ত তুলে দাঁড়িয়ে 'অল্লাহু-অক্‌বর' বলা।

২. 'কিয়াম' (উত্থান)—বাম কর-পৃষ্ঠের ওপরে ডান হাত রেখে, বুক অথবা নাভি স্পর্শ করে পড়তে হয়—

'ইন্নী বজ্জহ্‌তো লিল্লজী ফতরস্‌সমাবাতি বল্-অর্জ হনীফন্, ব মা অনা মিনল্মুশ্রিকীন্। ইন্নী সলাতো ব নুস্‌কী ব মহ্যায় ব মমাতী লিল্লাহ রব্বিল-আলমীন্। লা-শরীক লহু ব বিজালিক উমির্তু, ব অনা মিনল্-মুস্লিমীন্। অল্লাহুম্ম! অন্তল্মলিকো লা ইলাহ ইল্লা অন্ত, অন্ত রব্বী ব আনা অব্দুক জলমতু নফসী বঅতরপ্তু বিজম্বী, ফ-অগফির্, লী জুনুবী জমীঅন্, ইন্নহু লায়গফিরুজ্জুনুব ইল্লা অন্ত, বহ্‌দিনী অহ্‌সনল্-অখ্‌লাকি লা য়হ্‌দী লিঅহ্‌সনিহা ইল্লা অন্ত বস্রিফ অন্নী সয্যিঅহা লা য়স্রিফু অন্নী সয্যিঅহা ইল্লা অন্ত।'

('একেশ্বরে বিশ্বাসী আমি তাঁর দিকে মুখ করলাম, যিনি এই ভূমি ও আকাশের কারণ। আমি একাধিক ঈশ্বরে বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত নই। নিঃসন্দেহ আমার প্রার্থনা, আমার বলি, (কোরবানি) আমার জীবন ও মরণ সবই সেই জগতের প্রভুর জন্য। সেই ঈশ্বরের কোনো সাক্ষী নেই, তাঁর কাছ থেকে আদেশ এসেছে এবং আমি মুসলমান হয়েছি। হে ঈশ্বর! তুমিই একমাত্র প্রভু, তুমি

ছাড়া আর কোনো ঈশ্বর নেই। তুমি আমার প্রভু এবং আমি তোমার সেবক। আমি নিজের ওপরে অন্যায় করেছি, আমি আমার অপরাধ স্বীকার করলাম। আমার অপরাধ ক্ষমা করো, নিঃসন্দেহ, তুমি ছাড়া কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পারে না। আমাকে উত্তম শিষ্টাচার শেখাও, কারণ তুমি ছাড়া আর কেউ তা শেখাতে পারে না। আমার ওপর থেকে দুরাচারের প্রভাব সরাও, কারণ তুমি ব্যতীত তা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।')

নিম্ন প্রার্থনাটিও অনেক জায়গায় আসে—

'সুব্‌হানক অল্লাহুম্ম ! ব বিহম্‌দিক, ব তবারকস্‌মুক, ব তআলা জদ্দুক, ব-লা ইলাহ গৈরুক, অউজু বিল্লাহি মিনশ্‌শৈতানির্‌রজীম্।'

('হে প্রভু মঙ্গল হোক তোমার। তোমার নাম, তোমায় স্তুতি, সবই মঙ্গলময়, তোমার মহত্ত্ব কতো উত্তম, তুমি ছাড়া অন্য কেউ পূজ্য নেই, দুষ্ট শয়তানের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য হে প্রভু আমি তোমার শরণাগত।')

'বি-স্মিল্লাহির্‌রহ্‌মানির্‌রহীম্। অলহম্‌দু লিল্লাহি রব্বিল-আলমীন্। অর্‌রহ্‌মানির্‌রহীম্ ! মালিকি যৌমিদ্দীন্। ইয়্যাক নঅবুদু ব ইয়্যাক নস্তঈন্। ইহ্‌দিন্-সিস্‌রাতল্‌মুস্তকীম্ সিরাতল্লজীন অন্‌অম্‌ত অলৈহিম, গৈরিল্মগ্‌জূবি অলৈহিম্ ব লজ্জাল্লীন আমীন।'

('পরম দয়ালু কৃপাময় ঈশ্বরের নামে আরম্ভ করছি। সমস্ত প্রশংসাই জগদীশ্বরের জন্য যিনি অত্যন্ত দয়ালু, কৃপালু, যিনি কেয়ামতের দিনের প্রভু। হে আমার স্বামী, আমি তোমারই সেবা করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করি। আমাকে সঠিক পথের নির্দেশ দাও। তাদের পথে চলতে আমাকে আদেশ করো, যাদের প্রতি তুমি কৃপা বর্ষণ করেছ, তাদের পথে কখনোই নয়, যাদের ওপরে তোমার কোপ বর্ষিত হয়েছে, কিংবা যারা পথভ্রষ্ট।')

তারপর কোরাণ শরীফের কোনো কণ্ঠস্থ আয়াত জপ করা হয়। বিশেষত সুরত (অধ্যায়) ইখলাস, যাকে অনুপ্রাসের দৃষ্টান্ত হিসাবে দ্বিতীয় বিন্দুতে উদ্ধৃত করেছি।

৩. অতঃপর নমাজী 'অল্লাহু অক্‌বর' উচ্চারণ করে মাথাকে ততখানি ঝোঁকায় যে হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছায়। একে 'রকুঅ্' (নত হওয়া) বলা হয়। এই অবস্থায় কমপক্ষে তিনবার পড়তে হয়—

'সুব্‌হান রব্বিয়ল্-অজীম্!' (মহাপ্রভুর-মঙ্গল হোক)। এর সঙ্গে অথবা এর পরিবর্তে কেউ কেউ নিম্নলিখিত ব্যাক্যকেও পাঠ করেন—

'সব্‌হানক অল্লাহুম্ম ! রব্বনা ব বিহম্‌দিক অল্লাহুম্ম। অগ্‌ফিগ্‌রলী।'
('হে মহাপ্রভু ! তোমার মঙ্গল হোক, হে আমার স্বামী ! তোমার জন্যই সমস্ত স্তুতি, হে জগদীশ্বর ! আমাকে ক্ষমা করো')।

৪. তারপর নিম্ন বাক্য উচ্চারণ করে ঘাড় সোজা করে ঋজু হয়ে দাঁড়াতে হয়—

'সমিঅল্লাহু লিমন্ হমিদঃ' (যে তাঁর স্তুতি করে, প্রভু তা শ্রবণ করেন)।

'রব্বনা! ব লক-ল্-হম্দু' (হে আমার প্রভু! স্তুতি তোমারই জন্য)।

৫. পুনরায় নিম্ন বাক্যটিকে কমপক্ষে তিনবার উচ্চারণ করে, সিজ্দা (প্রণাম) করতে হয়, অর্থাৎ সিজ্দা এমনভাবে হবে যাতে পায়ের পাতা, হাঁটু, দুই হাত এবং ললাট ভূমি স্পর্শ করে।

'সুব্হান রব্বিয়ল্ অঅ্লা।' (আমার সর্বোচ্চ প্রভুর মঙ্গল হোক)।

এর সঙ্গে অথবা পরিবর্তে নিম্ন বাক্যও বলা হয়।

'সুব্হানকল্লাহুম্ম! রব্বনা ব বিহম্দিকল্লাহুম্ম! উগফির্লী' (মহাপ্রভু! মঙ্গল তোমার জন্য, স্তুতিও তোমার জন্য, হে প্রভু! আমাকে উদ্ধার করো।)

৬. অতঃপর জল্সা—অর্থাৎ দুই পা পিছনে মুড়ে বসে পড়া।

৭. তদনন্তর উপরে লিখিত ক্রমানুসারে সিজ্দা করতে হয়।

এত সব হয়ে গেলে পরে রাকাত অর্থাৎ নমন পূর্ণ হয়। অতঃপর নমাজীরা দ্বিতীয় রাকাতের জন্য দণ্ডায়মান হয়। সমস্ত কিছুই উপরে বর্ণিত ক্রমানুসারে আবারও করতে হয়।

৮. কঅদা (বসা)—দ্বিতীয় রাকাতের পর বসা অবস্থাতেই নিম্ন বাক্য পড়া হয়—

'অত্তহিয্যাতু লিল্লাহি বস্সলাতু বত্তয্যিবাতুস্সলামু অলৈক অয্যুহন্নবিয্যু। ব রহম্তুল্লাহি ব বরকাতুহুস্সলামু অলৈনা ব অলা ইবাদিল্লাহি-স্সালিহীন অশ্হদু অন্ লাইলাহ ইল্লল্লাহু ব অশহদু অন্ন মুহম্মদন্ অব্দুহু ব রসূলহু।'

('সমস্ত প্রার্থনা, নমাজ এবং পবিত্রতা ঈশ্বরের জন্য। হে নবী (মুহম্মদ)! তোমার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা ও আশিস বর্ষিত হোক। আমার এবং ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্তের ওপরে শান্তি বর্ষিত হোক। সাক্ষী দিচ্ছি, ঈশ্বর ব্যতীত কেউ পূজনীয় নয়, এবং আরও সাক্ষী দিচ্ছি যে মুহম্মদ তাঁর সেবক এবং দূত।')

৯. দুইয়ের বেশী রাকাত পড়তে হলে আবার দাঁড়িয়ে পূর্বের মতো আরম্ভ করতে হয়। তারপর বসে থাকা অবস্থাতে নিম্ন প্রার্থনা বাক্য পড়া হয়—

'অল্লাহুম্ম! সল্লি অলা-মুহম্মদিন্, ব অলা-আলি মুহম্মদিন কমা সল্লৈত অলা-ইব্রাহীম ব অলা-আলি-ইব্রাহীম, ইন্নক হমীদুন। মজীদন্। অল্লাহুম্ম। বারিক্ অলা-মুহম্মদিন ব অলা-আলি মুহম্মদিন্ কমা বারক্ত অলা-ইব্রাহীম ব অলা-অলালি-ইব্রাহীম ইন্নক হমীদুন্মজীদ্।'

('হে প্রভু মুহম্মদকে শান্তি দান করো, তাঁর সন্তানদের শান্তি দান করো ঠিক যেমন তুমি ইব্রাহীম এবং তাঁর সন্তান সন্ততিদের শান্তি দান করেছিলে। নিঃসন্দেহ, সমস্ত উচ্চ প্রশংসা তোমারই প্রাপ্য। হে প্রভু! মুহম্মদ এবং তাঁর

সন্তানদের আশীর্বাদ করো যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তার সন্তানদেব প্রতি কবেছিলে। নিঃসন্দেহ তুমি সমস্ত উচ্চ প্রশংসার যোগ্য')।

নীচের প্রার্থনা বাক্যটিকেও এর সঙ্গে যুক্ত কবা হয়—

'অল্লাহুম্ম! ইন্নী জলম্‌তু নফ্‌সী জুল্মন কসীরন্‌, ব লা যগফিরুজ্জ্‌ নূব ইল্লা অন্ত ফগফর্লী, মগ্‌ফিরতুন্‌ মিন্‌ ইন্দিক বঙ্গর্হ্নী ইন্নক অন্তল-গফরুর্‌হীম।'

(হে মহাপ্রভু! আমি নিজেব প্রতি অত্যন্ত অন্যায় করেছি এবং তুমি ছাডা কেউ অপরাধ ক্ষমা করতে পাবে না। অতঃপর তুমি তোমার ক্ষমা দিয়ে আমাকে মার্জনা করো, তুমি ক্ষমাশীল এবং কৃপালু। আমার প্রতি কৃপা করো।)

অথবা উপরোক্ত প্রার্থনার পরিবর্তে—

'রব্বীজ্‌অল্‌নী মুকীমুস্‌সলাতি ব মিন জুরিয়্যতী রব্বনা ব তকব্বল্‌ দুআঅ। রব্বনগ্‌ফির্লী ব লিবালিদিয্য ন লিল্‌ মোমিনীন য়ৌম য়কুমুল্‌হিসাব।' ('আমার প্রভু! আমাকে এবং আমার সন্তানদের নমাজের জন্য দণ্ডায়মান হবাব উপযুক্ত তৈরি কবো। আমার প্রার্থনা স্বীকার করো। হে আমার প্রভু! আমাকে, আমার পিতাকে এবং অন্যান্য সকল বিশ্বাসীদের কেয়ামতের দিনে ক্ষমা কবো।')

১০. সবশেষে ডাইনে ও বামে মুখ ফিরিয়ে প্রতিবার নিম্নের বাক্য বলে নমাজের সমাপন করা হয়—

'অস্‌সলামু অলৈকুম ব রহমতুল্লাহি।' (তোমার প্রতি শান্তি এবং প্রভুর কৃপা বর্ষিত হোক)।

কেউ কেউ কুনুত নামের এই প্রার্থনাটিও করে থাকেন।

'অল্লাহুম্ম! হ্‌দিনী ফীমন্‌ হদৈত ব আফিনী ফীমন্‌ আফৈত, ব তবল্লনী ফীমন তবল্লৈত ব বারিকী ফীমা অয়ুতৈত বকিনী শর্‌র্ মা কজৈত ফইন্নক তকজী ব লা য়ুক্‌জা অলৈক ইন্নহু লা য়জিল্‌লু মঁব্বালৈত তবারক্ত রব্বনা ব তআলৈত।'

('যাদের তুমি পথ নির্দেশ করেছ প্রভু! আমাকেও সেই পথনির্দেশ দাও, যাদের তুমি ক্ষমা করেছ, আমাকেও তাদের মধ্যে রাখো, যাদের তুমি বন্ধু করেছ, আমাকে তাদের মিত্র করো, যাদের তুমি মঙ্গলদান করেছ, আমাকেও সেরকম মঙ্গল প্রদান করো, কৃত পাপ থেকে আমাকে রক্ষা করো। নিঃসন্দেহ, তুমিই নির্ণয় করো এবং তোমার ওপরে কেউ নির্ণয় করতে পারে না। সত্যই সে কখনও অকীর্তিমান হয় না যাকে তুমি মিত্র করেছ। হে আমার প্রভু! তুমি মহান্‌ এবং মঙ্গলময়')।

উপরোক্ত প্রার্থনার পরিবর্তে কেউ নিম্নবর্ণিত প্রার্থনাটিও করেন—

'অল্লাহুম্ম! ইন্না নস্তই নুক ব নস্তগ্‌ ফিরুক ব নোমিনু বিক ব নতবক্কলু অলৈক ব নুসিনী অলৈকল্‌খৈর ব নশ্‌কুরুক ব লা নুকফ্‌রুক নুখ্‌লউ ব নত্রুকু মঁয্যফ জুরুক, আল্লাহুম্ম! ইয়্যাক নঅবুদু ব লক নুসল্লী ব নস্‌জুদু ব ইলৈক নস্‌আ ব নহফিদু ব নর্জু রহ্মতক ব নখ্‌শা অজাবক বিল্‌কুফ্‌ফারি মুল্‌হিক।'

('হে মহাপ্রভু ! আমি তোমার কাছেই সাহায্য এবং ক্ষমা প্রার্থী। একমাত্র তোমার প্রতিই বিশ্বাস এবং ভরসা করি। আমি তোমার শুভ আহ্বান করি, তোমাকে ধন্যবাদ জানাই এবং কখনও অস্বীকার করি না। যারা তোমার আজ্ঞা পালন করে না, আমি তাদের আমার কাছ থেকে পৃথক এবং পরিত্যাগ করি। হে জগদীশ্বর! তোমারই সেবা করি এবং তোমাকেই নত হয়ে প্রণতি জানাই, তোমার দিকে ধাবিত হই, তোমার করুণার আশা করি এবং তোমার কোপকে ভয় করি। নিঃসন্দেহ, অবিশ্বাসী (কাফিররা) তোমার কোপ লাভ করবে।')

নমাজের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কোরাণ শরীফে বলা হয়েছে—

'নিঃসন্দেহ, সলাত্ (নমাজ) তোমাদের কুকর্ম এবং অশ্লীলতা থেকে দূরে রাখে। ঈশ্বরকে স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ।' (২৬ : ৫ :১)

কাবা

যে উচ্চভাব এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেম নমাজের উপরোক্ত প্রার্থনার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে, পাঠক স্বয়ং তার ওপরে বিচার করতে পারেন। সাংঘিক নমাজেব মূল্য ইসলামের দৃষ্টিতে অতি উঁচুতে। বস্তুত ইসলাম সংঘ শক্তিকে বিকশিত করে। হাজার হাজার মুসলমান, এশিয়া, ইওরোপ এবং আফ্রিকা যে মহাদেশেই বাস করুক না কেন, যে সময় এক স্বরে, এক ভাষাতে এবং একইভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে ঈশ্বরের চরণে তাদের ভক্তি পৌঁছে দেবার জন্য একত্রিত হয়, তখন কত না আনন্দময় উৎসাহপূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। সেই মুহূর্তের সাম্যের কথা কি আর বলা যায়। একই সারিতে দরিদ্র এবং বাদশাহ উভয়ে দণ্ডায়মান হয়ে এই বার্তাই সকলের কাছে পৌঁছে দেয়, ঈশ্বরের সামনে সকলেই সমান।

ইসলামের চারটি ধর্মস্কন্ধের মধ্যে হজ অথবা কাবা যাত্রাও অন্যতম। কাবা আরবের একটি প্রাচীন মন্দির, মক্কা নগরে অবস্থিত। বিক্রমের প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে রোমক ইতিহাস লেখক অড্রিয়স সলস্ লিখেছেন—

'এদেশে একটি মন্দির রয়েছে, যা আরবদের কাছে অত্যন্ত পূজনীয়।'

মহাত্মা মুহম্মদের জন্মের প্রায় ছয়শত বছর আগেই এই মন্দিরের খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত ছিল (নিকটস্থ সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি প্রদেশ থেকেও হাজার হাজার যাত্রী প্রতি বছর এই মন্দির দর্শনার্থে আসত। পুরাণেও শিবের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের মধ্যে মক্কার মহাদেবের নাম পাওয়া যায়। হজ্র্ ্ল্-অস্বদ (কৃষ্ণ পাষাণ) ছিল সমস্ত আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। এটি কাবার দেওয়ালে স্থাপিত ছিল। আজও সেই পাথরে চুম্বন করা প্রত্যেক হাজীর (মক্কাযাত্রীর) কর্তব্য। যদিও কোরাণ শরীফে এর বিধান দেওয়া নেই, কিন্তু পুরাণের সমপর্যায়ের মাননীয় হাদীস গ্রন্থে এই ভূমিকে ঈশ্বরের দক্ষিণ হস্ত বলা হয়েছে। এটিই মক্কেশ্বরনাথ, যা কাবার সমস্ত মূর্তি ভগ্ন হওয়ার পরও ঠিক পূর্ববৎ বিদ্যমান আছে। শুধু এটুকুই নয়, এর

মহিমা মুসলমানদের মধ্যেও সঞ্চিত না হয়ে পারেনি। তারাও ওই পাথরটিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া ধর্মকর্মের অন্তর্ভুক্ত করেছে। যদিও অন্যত্র তারা মূর্তিপূজার ঘোর বিরোধী। এই পবিত্র মন্দির সম্বন্ধে কোরাণ শরীফে বলা হয়েছে—

'ঈশ্বর পবিত্র প্রথম ঘর, কাবাগৃহ নির্মাণ করেছেন। ঈশ্বর মহানুভব এবং জ্ঞানীদের জন্য এই উপদেশ।' (৫ : ১৩ : ৪)

যেভাবে কাবাকে 'প্রথম ঘর' 'পবিত্র স্থান' ইত্যাদি বলা হয়েছে, ঠিক সেইভাবে মক্কা ন্যায়ের জন্যও উম্মুলকুরা (গ্রামের জননী) অথবা প্রথম গ্রাম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে যে মক্কার এই মন্দিরে তিনশত ষাটটি মূর্তি ছিল। প্রারম্ভিক কালে যখন 'কোন দিকে মুখ করে নমাজ পড়া হবে' এই প্রশ্ন পয়গম্বর মুহম্মদের সামনে এসেছিল, তখন একেশ্বর অনুগামী মুহম্মদ মূর্তিপূর্ণ মক্কা নগরকে অযোগ্য মনে করে, পৌত্তলিক নয় এবং একেশ্বরের উপাসনা করে সেই ইহুদীদের মুখ্য স্থান জেরুজালেমের মন্দিরের দিকে মুখ করে নমাজ পড়ার বিধান আপন অনুগামীদের দিয়েছিলেন। এভাবে মক্কা নিবাসের অন্ত পর্যন্ত অর্থাৎ তেরো বছর পর্যন্ত এভাবেই নমাজ পড়া হতো। মদীনাতে যাবার পরও বহুদিন পর্যন্ত জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নমাজ পড়া হতো। অবশেষে ইহুদীদের অহংকার—আমাদের কাবার (জেরুজালেম) আশ্রয় মুহম্মদ অনুগামীদেরও নিতে হয়—দূর করার জন্য কোরাণ শরীফের নিম্ন বর্ণিত আদেশের বলে পবিত্র কাবা মন্দিরই মুসলমানদের কিব্‌লা (অগ্রিম স্থান) হয়। বাক্যটি এরকম—

'অজ্ঞানীরা বলবে, এই সব মুসলমানদের কি ঘটল যে তারা তাদের পূর্বের কিব্‌লা প্রত্যাহার করে নিল। হে মুহম্মদ, তুমি বলো, ঈশ্বরের কাছে পূর্ব পশ্চিম সবই সমান।' (২ : ১৭ : ১)

'হে মুহম্মদ! আমি আসমানের দিকে তোমার বারবার তাকানোকে লক্ষ্য করেছি। সুতরাং আমি তোমাকে সেই কিব্‌লামুখী করব, যা তোমার অভীষ্ট। অতএব তুমি যে দিকেই থাকো, সেখান থেকে তোমার মুখকে পবিত্র মসজিদের (কাবা) দিকে ফিরিয়ে নাও, এবং সেই সমস্ত লোক যাদের গ্রন্থ (তৌরাত) দেওয়া হয়েছে (অর্থাৎ ইহুদী) তারা নিঃসন্দেহে জানে যে তাদের ঈশ্বরের পক্ষ থেকেও এটি সঠিক।' (২ : ১৭ : ৩)

'যদি তুমি সম্পূর্ণ প্রমাণ আনো, তাহলেও গ্রন্থপ্রাপকেরা (ইহুদী) তোমার কিব্‌লার অনুগামী হবে না, আর তুমিও তাদের কিব্‌লার অনুগামী হবে না।'
(২ : ১৭ : ৪)

প্রথম বাক্যে কিব্‌লা পরিবর্তিত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত আক্ষেপের উত্তর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বাক্যে কিব্‌লা পরিবর্তনের বিধান দেওয়া হয়েছে। এই কিব্‌লার বিধানও বাস্তবে সমস্ত মুসলমানদের একতার অভিপ্রায়ে করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে—

'প্রভু! পূর্ব ও পশ্চিম তোমারই জন্য। যেদিকে মুখ ফেরাও সেদিকেই প্রভুর মুখ। নিঃসন্দেহ, ঈশ্বর সর্বব্যাপী এবং মহাজ্ঞানী।' (২ : ১৪ : ৩)

হজ

'সকলকে হজের জন্য আহ্বান করো যাতে দূর দূর থেকে পদব্রজে কিংবা উষ্ট্র পৃষ্ঠে তারা চলে আসে।' (২০ : ৪ : ২)

'তোমরা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে হজ ও উমরা পূর্ণ করো! (নির্ধারিত সময়ে কাবা যাত্রা করাকে হজ বলা হয় এবং অন্য সময়ে কাবা যাত্রাকে উমরা বলা হয়) কিন্তু যদি বাধা প্রাপ্ত হও তাহলে যা সহজলভ্য তাই উৎসর্গ করো। যতক্ষণ পর্যন্ত তা বৈধ স্থানে উপনীত না হয়, ততক্ষণ মস্তক মুণ্ডন করো না। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ পীড়িত হয় কিংবা তার শিরঃপীড়া থাকে, তাহলে সে রোজা বা কোরবানির দ্বারা তার বিনিময় করবে। যখন তোমরা নিরাপদ হবে, তখন তোমাদের মধ্যে যে হজের প্রাক্কালে উমরা দ্বারা লাভবান হতে চায়, সে সহজলভ্য কোরবানি করবে। কিন্তু যদি কেউ তা না পায়, তবে তাকে হজকালীন সময়ে তিনদিন এবং গৃহ প্রত্যাবর্তনের পর সাতদিন মোট দশদিন রোজা পালন করতে হবে। এই নিয়ম তাদের জন্য, যাদের বাসস্থান কাবার কাছে নয়।'

(২ : ২৪ : ৮)

অপ্রয়োজনীয় বিধায় 'তওয়াফ' (পরিক্রমা), 'সফা' ও 'মর্বা' পাহাড়ের মধ্য দিয়ে ঢিল ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড়ানো যাকে 'সঈ' বলা হয়—ইত্যাদি বিধি সম্বন্ধে বিশদ লেখা হলো না।

কোরবানি (বলিদান)

কোরাণ শরীফ অনুসারে নির্দিষ্ট সময়ে কিংবা অন্য কোনো পর্বে হজ পালন করা বিধি সম্মত। ইসলামের কোরবানি কোনো নতুন বিষয় নয়। ইষ্ট কিংবা দেবতাদের উদ্দেশে পশু বলি দেওয়া একটি প্রাচীন প্রথা। বিক্রমপূর্ব অষ্টম শতাব্দীতে 'তিগ্‌লতপেশর্' এবং 'শল্মেশর্' নামের অসুর বংশীয় রাজাদের ইষ্টদেব 'সকথ-বেনথ' ব্যবিলন নগরের বিশাল মন্দিরে আসীন হয়ে বলি গ্রহণ করতেন। নর্গল, অশিম, নিমজ, তর্তক, অদ্রম্লেশ, অম্লেশ নাশরশ, দেগন ইত্যাদি দেব সমুদায়, বিক্রমের বহু শতাব্দী পূর্বে এশিয়ার প্রাচীন নগরী কথ, হামা অলিত, সফর্বেম বাস করতেন এবং বলি গ্রহণ করতেন। মূর্তিপূজক বা পৌত্তলিক সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই পশুবলিদানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে থাকে। তবে অমূর্তিপূজক ধর্মও এই প্রথাকে অস্বীকার করেনি। ইহুদীদের উপাসনার বেদী সর্বদাই পশু রক্তে রঞ্জিত থাকত। তাদের 'শুল্ক' ও 'দগ্ধ' বলিদানের কথা বাইবেল পাঠকদের কাছে অবিদিত নেই। ইসলাম বহুক্ষেত্রে ইহুদী প্রথাকে সামান্য পরিবর্তন করে

ঠিক যেমন ছিল, প্রায় সেইভাবেই গ্রহণ করেছে। বলি বা কোরবানির সিদ্ধান্তও ইহুদী ধর্ম থেকে গৃহীত। এখানে উভয় ধর্মের বলির মধ্যে সমতা দেখানোর জন্য 'তৌরাত' এবং 'কোরাণ' থেকে কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হলো।

'That will offer his oblation for all his vows or for all his freewill offerings, which they will offer unto the Lord for a burnt offering. Ye shall offer at your own will a male without blemish, of the beeves, of the sheep, or of the goats. Blind or broken maimed, or having a wen, scurvy or scubbed, ye shall not offer these unto the Lord, nor make an offering by fire of them upon the altar unto the Lord… . Ye shall not offer unto the Lord, that which is bruised or crushed, or broken or cut.' (*Leviticus* 22 : 20-24)

'সেটা তার পূজা নিবেদিত হবে তার সমস্ত প্রতিজ্ঞার জন্য অথবা তার সম্পূর্ণ মুক্ত মনের নৈবেদ্যর জন্য, যা তারা প্রভুকে হোমের মাধ্যমে নিবেদন করবে। তোমরা স্বেচ্ছায় নিবেদন করবে একটি খুঁতহীন বলদ, অথবা মেষ অথবা ছাগ। অন্ধ অথবা শরীরের কোনো অংশ ভাঙা অথবা অঙ্গহীন, অথবা স্ফীতিযুক্ত, অথবা স্কার্ভি রোগগ্রস্ত—এরা প্রভুর কাছে নিবেদিত হবে না। এরা বলি অথবা যজ্ঞের মাধ্যমেও প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে না…তোমরা প্রভুকে এমন কোনো কিছু নিবেদন করবে না, যা কাটা, ছেঁড়া ভাঙা অথবা থেঁতলানো।'

'যখন মূসা তাঁর সম্প্রদায়কে বললেন, ঈশ্বর তোমাদের আদেশ করেছেন। একটি গাভীকে কোরবানি দাও…তারা উত্তরে বলল, তোমার ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করো, তিনি আমাদের বলুন, সেটি কেমনতর হবে। মূসা বললেন, ঈশ্বর আদেশ দিয়েছেন যে সেই গাভী যেন বৃদ্ধা বা শাবক না হয়, উভয়ের মাঝামাঝি। অতএব তোমরা ঈশ্বরের আদেশানুসারে কাজ করো। সম্প্রদায়ের লোকেরা আবার বলল, ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করো, গাভীর রঙ কি হবে। মূসা বললেন, ঈশ্বরের আদেশ সেই গাভী পীত বর্ণের হবে, যা দেখলে দর্শনকারীরা আনন্দিত হবে। তারা আবার বলল, তুমি ঈশ্বরের কাছে জানতে চাও সেই গাভীটি কি প্রকৃতির হবে। মূসা বললেন, ঈশ্বরের আদেশ, এমন গাভী হবে না, যে পরিশ্রম করে, চাষের কিংবা সেচের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। গাভীটি যেন নিখুঁত হয়।'

(২ : ৮ : ৬-৯)

এভাবে ইহুদী এবং কোরাণের বলিদানের মধ্যে সমতা থাকলেও কিছু পার্থক্যও রয়েছে। সেখানে ইহুদী শাস্ত্র অনুসারে বলিদানের পর পশু মাংস হারুন বংশীয় প্রধান পুরোহিত এবং তাঁর সহায়ক অনেক পুরোহিত দ্বারা আগুনে হোম করা হতো। সেখানে কোরাণের বিধি অনুসারে পশু হনন করার পরই সমস্ত বিধির

অস্ত হয়। সারাংশ এই যে ইহুদীদের বলিদান পুরাণ-কথিত যাগযজ্ঞ, গোমেধ ইত্যাদির সঙ্গে তুলনীয়, আর ইসলামের কোরবানি দুর্গা, কালী ইত্যাদির কাছে উৎসর্গীকৃত বলির সঙ্গে তুলনীয়। বস্তুত পারসিকদের নিরামিষ শুদ্ধ বানস্পত্য হবনের মধ্যে আমিষ হবন একটু বর্ধিত করলেই ইহুদীদের বলির সমতুল্য হয়। ইসলাম হবন ইত্যাদির বাধা দূরে সরিয়ে কেবলমাত্র মাংস বলিকেই স্বীকৃতি দিয়েছে।

কোরাণে যদিও কোরবানির বর্ণনা এসেছে, কিন্তু কোথাও কোথাও তাকে সর্বোপরি পুণ্যকর্ম বলে স্বীকার করতে অস্বীকার করাও হয়েছে—

'ঈশ্বরের কাছে সেই কোরবানির রক্তমাংস পৌছায় না। পৌছায় তোমাদেব সংযম।' (২২ : ৫ : ৪)

প্রকৃত পক্ষে ইসলামের কোরবানি সেই 'সুন্নতে-ইব্রাহীম' (ইব্রাহিমী রীতি) এবং শরিয়ত-মূসবী (মূসার সম্প্রদায়) এই দুইয়ের অনুগমন মাত্র। প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা প্রথাকে একেবারে অস্বীকার করা বা পরিত্যাগ করা বড় বড় সংশোধকদের পক্ষেও কঠিন কাজ। মহাত্মা মুহম্মদ আরব নিবাসীদের অত্যন্ত শ্রদ্ধাস্থল কাবাকে স্বীকার করেছেন। তাদের অনেক রীতিকেও তিনি গ্রহণ করেছেন। যেমন—

(১) ইলহাম্—মক্কা প্রবেশের আগে সমস্ত হাজীরা এক জায়গাতে জড়ো হয়ে একখণ্ড বস্ত্রে সারা শরীর আবৃত করে।

(২) তওয়াফ—কাবার পরিক্রমা।

(৩) সঈ—সফা এবং মর্বা পাহাড়ের মাঝখানে দৌড়ানো।

(৪) অরফাত—একটি বিশেষ স্থান। যেখানে হাজীরা অবস্থান করে।

উপরোক্ত চারটি বিষয় মূর্তিপূজক আরব দেশেও যথারীতি এইভাবেই ছিল। কৃষ্ণপ্রস্তরকে (হজ্জ্ল্ অস্বদ) চুম্বন করার প্রথাটিও ইসলামের আগে থেকেই ছিল বলে মনে হয়। খলিফা ওমর এই কৃষ্ণপ্রস্তর সম্বন্ধে বলেছেন—

'নিঃসন্দেহ, আমি জানি যে তুমি একটি পাথর মাত্র। এই পৃথিবীতে ভালো মন্দ কোনো কিছু করতেই তুমি সক্ষম নও। যদি নবী মুহম্মদকে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহলে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না।' (মিশ্কাত্)

কাবাতে সেখানকার মূর্তিদের উদ্দেশে বলিদান আগেও হতো! কোরাণ সেই বলিদান অথবা কোরবানি ওই মূর্তিদের নামে না দিয়ে ঈশ্বরের নামে দেবার আদেশ দেয়।

এ পর্যন্ত যতদূর আমরা আলোচনা করেছি তাতে প্রসঙ্গক্রমে রোজা ইত্যাদি প্রকরণে দান অথবা জাকাতের বর্ণনাও করা হয়েছে। অতঃপর এ বিষয়ে অধিক ব্যাখ্যা করা বাহুল্য হয়ে যাবে। দান খয়রাতের বিষয়ে কোরাণ শরীফ অত্য-

কোনো ধর্মের চেয়ে কম গুরুত্ব দেয় না। অতিথির পরিচর্যা, অনাথ, ভিক্ষুকদের আহার্য দান ইত্যাদি অভ্যাস আরব নিবাসীদের আগে থেকেই ছিল। লুঠতরাজ, খুনখারাপি যদিও প্রকৃতিতে ছিল তথাপি উপরোক্ত গুণাবলীও তাদের মধ্যে যথেষ্টই ছিল।

মূর্তিপূজা খণ্ডন

মানুষ যাকে শুভকর্ম মনে করে তা নিজে করে এবং অন্যকেও করতে উৎসাহিত করে, আবার যাকে অশুভকর্ম মনে করে তা যাতে কেউ না করে এবং নিজেও না করে সেই বিষয়ে যত্নবান হয়। ওপরে শুভকর্মের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। অশুভ কর্মের মধ্যে কোরাণ শরীফ পৌত্তলিকতা বা মূর্তিপূজাকেও ধরে। অতএব এই বিষয়ে কিছু বর্ণনা দেওয়ার প্রয়োজন আছে।

বিক্রম পূর্ব শতাব্দীতে পূর্ব মিশর, অসুর (অসীরীয়), কলদান, ফিলিস্তীন, মিডিয়া, যবন (গ্রীস), রোম আদি দেশে অনেক দেবদেবীর মূর্তি পূজিত হতো। আরবেও এরকম অনেক দেবালয় ছিল যার মধ্যে কাবা মন্দির ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ।

বদ্দ, সুবাঅ, য়গুস, যউক, নস্র (৭২ : ২ : ৩) এবং হুব্ল, লাত, মনাত, উজ্জা ইত্যাদি বহুদেব-প্রতিমার নাম কোরাণ শরীফে পাওয়া যায়। যেমন কল্ব, হম্দান, মজহাজ, মুরদ। এতদ্ব্যতীত হময়ান জাতির ইষ্ট দেবতা ছিল ক্রমশ মানবাকৃতির বদ্দ, সিংহাকৃতির য়গুস, অশ্বাকৃতির য়উক এবং বাজপাখীর আকৃতির নস্র। কাবার প্রধান দেবপ্রতিমা ছিল হুব্ল (আকালের সময় বৃষ্টি নামায়)। তাছাড়া অমরূ, যাকে সিরিয়া প্রদেশের বল্কা নগর থেকে এনে কাবাতে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। তখনকার আরব নিবাসীদের কাছে এই মূর্তিগুলির যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাদের নামে অনেক চমৎকার কাহিনী প্রচলিত ছিল। যার ওপরে সাধারণ জনগণের গভীর বিশ্বাস ছিল। যখন মক্কা বিজয় সম্পন্ন করে মহাত্মা মুহম্মদ কাবা মন্দিরের মূর্তি ভাঙার আদেশ দেন, তখন কেউ প্রথমে সাহস করে এগোয়নি, অতঃপর আলী এগিয়ে এসে সেই কাজ সম্পন্ন করেন।

মূর্তিপূজা থেকে মানুষের শ্রদ্ধা দূর করার জন্য কোরাণ শরীফে অনেক বাক্য বলা হয়েছে। সেই বাক্যের প্রভাব এত সুদূর প্রসারী হয় যে হাজার হাজার লোক মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে ইসলাম ধর্মকে স্বীকার করে। মক্কা বিজয়ের সময়ে সেখানকার অনেক অগ্রণী লোক মুসলমান হয়েছিল। নীচে কোরাণ শরীফের কিছু বাক্য উদ্ধৃত করা হলো যেখানে মূর্তি পূজাকে নিন্দা করা হয়েছে—

(১) যখন কোনো শুভ ফলপ্রাপ্ত হলো, তখন তারা (মূর্তিপূজকরা) তার মধ্যে মূর্তিদের কৃতিত্ব দেখল কিন্তু ঈশ্বর তাদের চেয়ে এবং যাদের তারা সাক্ষী মানছে বা কৃতিত্বের অংশীদার বানাচ্ছে, অনেক বড়। তারা কি কখনোই ঈশ্বরের সঙ্গে তুলনীয় হতে পারে যারা স্বয়ং কারো দ্বারা সৃষ্ট এবং নিজেরা কোনো

কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম। তারা না পারে নিজেদের সাহায্য করতে, না পারে ভক্তদের সাহায্য করতে।...সেই মূর্তিদের কি পা আছে যার দ্বারা তারা চলা ফেরা করে, কিংবা হাত আছে, যার দ্বারা কোনো কিছুকে ধরতে পারে অথবা চক্ষু আছে যার দ্বারা দেখতে পায় কিংবা কান আছে যার দ্বারা তারা শুনতে পায়।'

(৭ : ২৪ : ২-২৬)

(২) 'হে মুহম্মদ! জিজ্ঞাসা করো তোমাদের ইষ্টদের শরিকদের মধ্যে কেউ আছে যে সৃষ্টিকে নির্মাণ করে তারপর তাকে আবার পরিবর্তিত করে? বলো ঈশ্বরই সৃষ্টিকে উৎপন্ন করেন এবং তার পুনরাবৃত্তি করেন, তবে কেন অস্বীকার করো? জিজ্ঞাসা করো, তোমার শরিকদের মধ্যে কে সত্যের আজ্ঞা দেয়। বলো একমাত্র ঈশ্বরই সত্য শিক্ষা দেন। অতঃপর যিনি সত্য পথ দেখান তিনি শ্রেষ্ঠ, না কি তারা, যারা কোনো শিক্ষা দিতে অক্ষম এবং স্বয়ং আজ্ঞার অপেক্ষায় থাকে। এটা তোমাদের কিরকম ন্যায়? এরা কল্পনা ব্যতীত অন্য কোনো কিছুর অনুসরণ করছে না। কিন্তু সত্য বিষয়ের মধ্যে অনুমানের আশ্রয় নেওয়া কোনো কাজেই লাগে না। তোমরা যা কিছু করো, সবই পরমেশ্বর জ্ঞাত আছেন।' (১০ : ৪ : ৪-৬)

(৩) 'সেই ঈশ্বর ব্যতীত আর কারো উপাসনা করো না। তোমরা এবং তোমাদের পিতৃ পিতামহরা (রুদ্র ইত্যাদি মনগড়া) কতগুলো নামকরণ করেছিল। ঈশ্বর তাদের পক্ষে কোনো প্রমাণ পাঠাননি। এই সৃষ্টির মধ্যে ঈশ্বর ছাড়া আর কারো শাসন নেই। তিনি আদেশ দিচ্ছেন, তাঁকে ছেড়ে অন্য কোনো কিছুকে পূজ্য করো না। এইটিই সহজ সরল পথ, কিন্তু অনেকে একথা অবগত নয়।' (১২: ৫ : ৪৫)

(৪) 'ঈশ্বর ব্যতিরেকে, আর যাকে তারা আহ্বান করে তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না এবং স্বয়ং নিজেরাই উৎপন্ন।' (১৩ : ৩ : ১১ :

(৫) 'ঈশ্বর বললেন দুটি ইষ্ট গ্রহণ করো না, নিঃসন্দেহ ঈশ্বর এক। এতএব আমাকে (ঈশ্বরকে) ভয় করো।' (১৩ : ৭ : ১)

(৬) 'যখন ইব্রাহীম তাঁর পিতাকে বললেন—হে পিতা! কেন তাদের উপাসনা করছেন। যাঁরা দেখতেও পায় না, শুনতেও পারে না, এবং আপনার কোনো কাজেও আসে না।' (১৯ : ৩ : ২)

(৭) 'যখন ইব্রাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বললেন—এই মূর্তিগুলি কি, যাদের ভরসায় তোমরা বসে আছ। তারা বলল, আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষের কাল থেকে এদের পূজিত হয়ে আসতে দেখেছি। ইব্রাহীম বললেন, নিঃসন্দেহ, তুমি এবং তোমাদের পূর্বপুরুষ নিতান্ত ভ্রান্তির মধ্যে ছিল। তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্য কথা বলছ না মিথ্যা। ইব্রাহীম বললেন, তোমাদের ঈশ্বর আকাশ ও মাটির স্বামী। তিনিই এর সৃষ্টিকর্তা এবং আমি

একথা বিশ্বাস করি। ঈশ্বরের নামে শপথ করছি যখন তোমরা পিঠ ফিরে চলে যাবে তখন তোমাদের ইষ্টদের ভালোমতো মেরামত করব। অতঃপর ইব্রাহীম বড় একটি মূর্তি বাদে বাকী সমস্তকে ভেঙে খান্ খান্ করে ফেললেন। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, আমাদের ইষ্টদের সঙ্গে কে এমন ব্যবহার করল, যেই একাজ করে থাকুক সে নিতান্ত অধার্মিক। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলল, আমরা এক যুবককে এদের সঙ্গে কথা বলতে দেখেছি। তারা বলল, ওকে ধরে আমাদের সামনে নিয়ে এসো দেখি। তারা জিজ্ঞাসা করল হে ইব্রাহীম আমাদের ইষ্টদের সঙ্গে এই ব্যবহার তুমি করেছ? ইব্রাহীম বললেন মনে হয় ওই বড় মূর্তিটিই এসব করেছে, তবে সে যদি বলতে পারে তাকে জিজ্ঞাসা করে নাও। অতঃপর তিনি আপন মনে ভাবলেন এবং বললেন, ভ্রাতৃগণ, তোমরা অবশ্যই অন্যায়কারী। তোমরা এমন বস্তুর উপাসনা করো যে তোমাদের কোনো লাভই দিতে পারে না, লোকসানও করতে পারে না। আমি তোমাদের এবং ঈশ্বর ছাড়া যাদের পূজা তোমরা করো এই দুই বিষয় নিয়ে অত্যন্ত বিরক্ত। তোমাদের কি জ্ঞান নেই?' (২১ : ৬ : ২-১৭) (২৬ : ৫ : ১)

(৮) 'ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে তোমরা স্মরণ করো। আমাকে দেখাও দেখি পৃথিবীতে তাঁরা কি বানিয়েছে?' (৪৬ : ১ : ৪)

কাবা মন্দিরে মূর্তি ভাঙার সময় হজরত মুহম্মদ যে বাক্যকে অনেকবার করে উচ্চারণ করেছিলেন, তা হলো—

'জাঅ-ল্ হক্ক, ব জহকল্বাতিলু, ইন্নল্বাতিলু কান জহূক।'

'সত্য এসেছে, মিথ্যা পালিয়েছে, নিঃসন্দেহ, মিথ্যা পলায়নবাদী'।

(১ : ৯ : ৫)

নবম বিন্দু

আচার-বিচার, দণ্ডনীতি

অষ্টম বিন্দুতে কোরাণ শরীফের ধর্মানুষ্ঠানের বর্ণনা করা হয়েছে। এখানে কোরাণ শরীফের আচার বিষয়ক উপদেশকে সঙ্কলিত করা হবে। আচারের মধ্যে প্রথমেই আসে ভক্ষ্য-অভক্ষ্য বিচার। প্রায় সব ধর্মই ভক্ষ্য (হালাল) এবং অভক্ষ্য (হারাম) বিষয়ে কিছু বিধান দিয়ে থাকে। স্মৃতিতে বলা হয়েছে 'পঞ্চ-পঞ্চ নখা ভক্ষ্যা'। ইহুদী ধর্ম বলে—'তোমরা কখনো রক্ত পান করো না।'

(Levi ৭ : ২৬)

'চেরা খুর আছে অথবা জোগালী করে এরকম ভক্ষ্য।' (১১ : ৩ :)

'পাখা এবং ছাল আছে এমন জলচর ভক্ষ্য।' (১ : ৯)

'নিজেরা হনন করেছ কিংবা কোনো জন্তুর দ্বারা শিকার হওয়া প্রাণী ভক্ষ্য।'

(১৭ : ১৫)

কোরাণ শরীফে বলির যোগ্য পশুর সেই লক্ষণ গুলিকে স্বীকার করা হয়েছে যা ইহুদীদের গ্রন্থে ছিল। এমনিতেই ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ক নিয়মগুলিকেও তাদের কাছ থেকেই নেওয়া হয়েছে, এবং সেই কথা কোরাণ শরীফে নিম্ন উদ্ধৃতির দ্বারা স্বীকারও করা হয়েছে—

'গ্রন্থ প্রাপকদের (ইহুদীদের) জন্য যা কিছু বৈধ এবং ভক্ষ্য তা তোমাদের জন্যও বৈধ হলো এবং তোমাদেরগুলি তাদের জন্য।' (৫ : ১ : ৪)

'ইহুদীদের জন্য যা কিছু আমি অভক্ষ্য স্থির করেছিলাম, তা তোমাদের জানানো হয়েছে।' (১৩ : ১৫ : ৮)

ভক্ষ্যাভক্ষ্য

এখানে ভক্ষ্যাভক্ষ্য বিষয়ে একটি 'আয়াত' উদ্ধৃত করা হলো, যার ভাব কোরাণ শরীফে অনেকবার বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হয়েছে।

'মৃত প্রাণী, রক্ত, শুকর মাংস, আল্লাহ্ ব্যতীত দ্বিতীয় (কোনো দেবতা বা প্রতিমা ইত্যাদি) কারো নামে উৎসর্গীকৃত প্রাণী, দম বন্ধ হয়ে মৃত প্রাণী, শৃঙ্গাঘাতে মৃত প্রাণী এবং হিংস্র জন্তুতে ভক্ষণ করা প্রাণীর মাংস—তোমাদের জন্য অভক্ষ্য বা হারাম। কোনো জায়গার নামে বলি দেওয়া কিংবা পাশা খেলা (দ্যূত ক্রীড়া) তোমাদের জন্য পাপকর্ম।' (৫ : ১ : ৩)

'ঈশ্বর তোমাদের জন্যই চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করো।' (১৬ : ১ : ৫)

উপরোক্ত বাক্যের দ্বারা ভক্ষ্যাভক্ষ্যকে সুস্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। তবে 'ইহ্‌লামের' চার মাস শিকার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। (৫ : ১৩ : ২,৩)

চুরি ও হত্যার বিষয়ে বলা হয়েছে—

'হে মুসলমানগণ! অপরের সম্পত্তি যার ওপরে তোমার অধিকার নেই, তা গ্রাস করো না। তবে তোমাদের মধ্যে যদি হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে সওদা হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে তা স্বতন্ত্র বিষয়। তোমরা নিজেদের মধ্যে খুনোখুনী করো না, নিঃসন্দেহ, ঈশ্বর তোমাদের প্রতি দয়াবান।' (৪ : ৫ : ৪)

মদ্যপান

মদ্যপান—আরবে তখনকার দিনে এই বস্তুটির বহুল প্রসার ছিল। কোরাণ শরীফে বলা হয়েছে—

'হে মুসলমানগণ! যখন তোমারা নেশাগ্রস্ত থাকবে, নমাজে ততক্ষণ পর্যন্ত উপস্থিত হয়ো না। যতক্ষণ না তোমরা যা বলছ তাকে বুঝতে সক্ষম হও।'
(৪ : ৭ : ১)

অষ্টম বিন্দুতে আমরা আলোচনা করেছি যে নমাজে অংশ গ্রহণ করা মুসলমানদের প্রধানতম কর্তব্যের একটি। তবে অবশ্যই সুস্থ অবস্থায়; নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সেখানে উপস্থিত হওয়ার অর্থ পাপের ভাগী হওয়া। এভাবে অপ্রত্যক্ষ রূপে কোরাণ শরীফ মদ্যপানকে নিষেধ করেছেন। তা ছাড়াও আয়াত (২ : ২৭ : ৩)-এর মধ্যে জুয়া এবং মদ্যপানকে মহাপাপ বলা হয়েছে।

শারীরিক স্বচ্ছতা বিষয়ে আগেই বলা হয়েছে। কোরাণ গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হওয়ার বিধান দেয় না, তবে খৃস্টীয়দের প্রশংসা করার সময় তাদের মহান্ সন্তদের নাম যেরকম সম্ভ্রমের সঙ্গে নেওয়া হয়, তাতে মনে হয়; বিদ্বান সদাচারী সাধুদের উপস্থিতিকে কোরাণ বিরোধিতা করে না।

ন্যায় ব্যবস্থা

প্রকৃত মুসলমানদের জন্য পবিত্র কোরাণ বলছেন—

'যারা আপন স্ত্রী এবং তাদের দক্ষিণ হস্তের সম্পত্তিকে (দাসীগণ) বাদ দিয়ে অন্যত্র তাদের কাম প্রচেষ্টাকে রোধ করে।' (৭০ : ১ : ২৯,৩০)

দাসী বা রক্ষিতাদের ইসলামে এক প্রকারে পত্নীর মতোই স্বীকার করা হয়েছে। স্ত্রী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

'রজঃস্বলা হওয়ার কালে তুমি স্ত্রীদের কাছ থেকে দূরে থাকো, এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের কাছে যেও না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা শুদ্ধ হয়।' (২ : ২৮ : ১)

'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না, এবং ঈশ্বরকে ভয় করো।' (৩ : ১৪ : ১)

উপরোক্ত কোরাণ বাক্যে সুদ নেওয়াকে নিষেধ করা হয়েছে।

সেই সময় আরবের রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। সারা দেশ চরম অব্যবস্থার মধ্যে ছিল। শাসন এবং সুব্যবস্থার কোনো নাম গন্ধও ছিল না। যখন শান্তিপ্রিয় মহাত্মা মুহম্মদ শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস শুরু করেন, তখন তাঁর ন্যায়-বিষয়ক নিয়ম এবং ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে। এই ব্যবস্থার নির্দেশ কোরাণ শরীফের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। তখনকার দিনে পারস্পরিক লেনদেনের বিষয়ে কোনো কাগজপত্র, লিখিত দলিল থাকত না, যার ফলে তা নিয়ে বিবাদ উপস্থিত হলে বিচারকারীদের অত্যন্ত কঠিন সমস্যায় পড়তে হতো। কোরাণ শরীফে সেজন্য সর্বদা দস্তাবেজ লেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে—

'যখন একে অন্যের সঙ্গে কোনো নির্দিষ্টকালের জন্য ধারের আদান প্রদান করবে, তখন তাকে লিখিত রাখো এবং তোমাদের মধ্যে কোনো একজন যেন ন্যায়ভাবে সমস্ত বিষয়টি লিখে দেয়।' (২ : ৩৯ : ১)

দায় ভাগ

অনেক ধর্মে স্ত্রীলোককে সম্পত্তির দায়ভাগের অধিকারিণী মনে করা হয় না। ইসলাম তাদের যেমন আরবের সেই জঘন্য পরিবেশ থেকে উদ্ধার করে, যেখানে তারা দাসী অথবা বিলাস সামগ্রীর অতিরিক্ত কোনো মহার্ঘ বস্তু বিবেচিত হতো না, তেমনিই তাদের দায়ভাগের অধিকারিণীও করে। যদিও তাদের অধিকার পুরুষের সমপর্যায়ের ছিল না। তবুও সেই সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যতটুকু দেওয়া হয়েছিল, সেটাই ছিল অনেক। কোরাণে বলা হয়েছে—

'মাতা-পিতা, আত্মীয় পরিজনেরা মৃত্যুর সময় যা সামান্য কিছু সম্পত্তি রেখে যায়, তাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই অংশ আছে। ঈশ্বর তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যে তোমাদের সন্তানদের মধ্যে একটি পুত্রের অংশ দুই কন্যার অংশের সমান। কিন্তু যদি কন্যার সংখ্যা দুইয়ের অধিক হয়, তবে তাদের জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ, আর যদি এক কন্যা থাকে তাহলে অর্ধাংশ দায়ভাগ হয়। মৃত পুরুষের সন্তান থাকলে, তার মাতা-পিতা এক ষষ্ঠাংশ দায় ভাগের অধিকারী হয়, আর মৃত ব্যক্তি নিঃসন্তান হলে, তার সম্পত্তির দায়ভাগী তার মাতা পিতা হবে এবং মাতার অংশ হবে, এক তৃতীয়াংশ, যদি অন্য ভাই বোন থাকে, তাহলে মাতার প্রাপ্য হবে এক ষষ্ঠাংশ। কিন্তু এ সমস্ত কিছুই হবে যদি মৃত ব্যক্তি কোনো বসীয়ৎ (উইল বা ইচ্ছাপত্র) করে গিয়ে থাকে তাহলে তাকে সম্পূর্ণ এবং যদি কোনো ঋণ থাকে তা পরিশোধ করার পর।' (৪ : ২ : ১)

'যদি সে নিঃসন্তান হয়, তাহলে তুমি তোমার আপন পত্নীর সম্পত্তির অর্ধেক

দায়ভাগী, কিন্তু যদি তার সন্তান থেকে থাকে, তাহলে তোমার জন্য এক চতুর্থাংশ। এবং এটিও কার্যকর হবে ঋণ পরিশোধ এবং বসীয়তের দাবি পূরণ করার পর। নিঃসন্তান মৃত পুরুষের এক চতুর্থাংশ এবং সন্তানের এক অষ্টমাংশ দায়ভাগের অধিকারিণী তাদের স্ত্রীরা। তাও ঋণ পরিশোধ এবং বসীয়ৎ সম্পূর্ণ হওয়ার পর।'
(৪ : ২১)

কলালা অবস্থা থাকলে অর্থাৎ পিতৃ-পুত্রহীনতায়—

'যে সমস্ত স্ত্রী-পুরুষের পিতা-পুত্র ইত্যাদি দায়ভাগী নেই, ভাই কিংবা বোন আছে, তাহলে প্রত্যেকের জন্য এক ষষ্ঠাংশ আর সংখ্যায় অধিক হলে সকলে মিলে এক তৃতীয়াংশের ভাগীদার হবে। এই ব্যবস্থাও গৃহীত হবে ঋণ পরিশোধের পর এবং কারো পক্ষে হানিকর নয় এমন ইচ্ছাপত্র পূর্ণ হওয়ার পর।' (৪ : ২ : ২)

এই বিষয়ে আরেক জায়গায় বলা হয়েছে—

'যদি কোনো পুরুষ সন্তানহীন অবস্থায় মারা যায়, এবং তার কোনো ভগ্নী থাকে তাহলে তার জন্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ বরাদ্দ থাকবে। এভাবে ভাইও সন্তানহীনা ভগ্নীর সম্পত্তির দায়ভাগী। যদি ভগ্নীর সংখ্যা দুই হয়, তাহলে তাদের জন্য সম্পত্তির দুই তৃতীয়াংশ। স্ত্রী-পুরুষ, যারাই উত্তরাধিকারী হবে, তাদের মধ্যে পুরুষের অংশ স্ত্রীর অংশের চেয়ে দ্বিগুণ হবে।' (৪ : ২৪ : ৫)

দণ্ড

যদি উত্তরাধিকারী নাবালক হয়ে থাকে তাহলে তার অভিভাবকদের জন্য বলা হয়েছে—

'যতক্ষণ পর্যন্ত তারা সাবালক না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের উত্তম শিক্ষাদান করো। যখন তার মধ্যে বুদ্ধির উৎকর্ষতা দেখবে, তখন তাকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দাও। ব্যর্থ ব্যয় করে নাবালকের সম্পত্তি গ্রাস করো না। যদি অভিভাবক নির্ধন হয়, তাহলে উক্ত সম্পত্তি থেকে যথার্থ প্রয়োজন মতো ভোগ করতে পারে, কিন্তু যারা সম্পন্ন, তাদের এই অবস্থা থেকে বিরত থাকা উচিত, এবং যখন ন্যায্য অধিকারীকে সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করবে, তখন তার সাক্ষী রাখো।' (৪ : ১ : ৬)

এ ছাড়াও বলা হয়েছে—

'যে অনাথের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করে সে প্রকৃতপক্ষে অগ্নিভক্ষণ করে এবং সে নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।' (৪ : ১ : ১০)

কোরাণ শরীফে অপরাধীদের জন্য কঠোর দণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। এর পিছনে হয়তো এই ভাবনা ছিল যে, দণ্ডের ভীষণতা অপরাধীর সংখ্যা হ্রাস করবে। তবে যেহেতু মানুষ সর্বজ্ঞ নয় সেজন্য অনেক সময় দেখা যায় যে অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ বিচারকের হাত থেকেও নিরপরাধীরা দণ্ড লাভ করেছে।

১) চৌর্য বৃত্তির দণ্ড।

'যে পুরুষ অথবা স্ত্রী, চুরি করে, তার হাত কেটে ফেলো, সেটাই তাদের কর্মের সমুচিত ফল।' (৫ : ৬ : ৪)

তৌরাত (ইহুদীদের পবিত্র গ্রন্থ, Leviticus $\frac{24}{17-21}$) গ্রন্থে মানুষ খুনের জন্য অঙ্গের পরিবর্তে অঙ্গ এবং প্রাণের পরিবর্তে প্রাণ নেওয়ার বিধান দেয়। কোরাণ শরীফও প্রায় সেভাবেই বলেন—

'প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, কানের বদলে কান, নাকের বদলে নাক, দাঁতের বদলে দাঁত এবং আঘাতের বদলে সমপরিমাণ আঘাত। তবে যদি আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্ষমা করে দেয় তাহলে অপরাধীর মুক্তি।' (৫ : ৭ : ২)

২) ব্যভিচার দণ্ড

ব্যভিচারের জন্য ইসলাম মনুর অপেক্ষা হাল্‌কা দণ্ডবিধান করেছেন।—

'ঈশ্বরের ব্যবস্থার মধ্যে সেই (ব্যভিচারী, ব্যভিচারিণী) উভয়ের প্রতিই কোনো দয়া দেখিও না। উভয়কেই একশো বার বেত্রাঘাত করো এবং তাদের যন্ত্রণা বিশ্বাসী লোকেরা দেখুক।' (২৪ : ১২)

কিন্তু এই একই অপরাধে, দাসীদের জন্য অর্ধেক দণ্ডের বিধান দেওয়া হয়েছে। (৪ : ৪ : ৩)

সদাচার

কোরাণ শরীফ অনুসারে কৃপণতাও একটি অপরাধ, এক জায়গায় বলা হয়েছে—

'যে কৃপণতা করে এবং অপরকেও সেরকম করতে শেখায়; যা কিছু ঈশ্বর তাকে দিয়েছেন, তাকে গোপন করে রাখে, এ ধরনের নাস্তিকদের জন্য ভীষণ যন্ত্রণা তৈরি করা হয়েছে।' (৪ : ৬ : ৪)

সেই সঙ্গে অপব্যয় সম্বন্ধেও বলা হয়েছে—

'অল্লাহু লা য়ুহিব্ব্‌ুল্‌মুস্রিফীন্' (৭ : ৩ : ৬)

(ঈশ্বর অপব্যয় পছন্দ করেন না)।

কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় বিস্তারিত বিবরণে না গিয়ে দুই তিনটি আচার সম্বন্ধীয় কোরাণ বাক্য উদ্ধৃত করা হলো—

(১) 'শুভকর্ম করো, এবং মার্জনা ভিক্ষা করো, অজ্ঞানীদের উপেক্ষা করো।' (৭ : ২৪ : ১১)

(২) 'যে তার প্রতি ঘটা অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয়, তাকে কিছু বলার নেই। বলা তাদের, যারা মানুষের প্রতি অন্যায় করে অথচ পৃথিবীতে ব্যর্থ ধর্মাত্মা হওয়ার চেষ্টা করে। তাদের জন্য ঘোরতর যন্ত্রণা অপেক্ষমান। যারা ক্ষমা করে এবং সন্তোষ বজায় রাখে তারা অত্যন্ত সাহসিকতার কাজ করে।' (৫২ : ৪ : ১২-১৪)

(৩) 'তোমার সন্তান তোমাকে ঈশ্বরের নিকটে স্থান করে দিতে পারে না। যারা শ্রদ্ধালু এবং সৎ কাজ করে তাদের দ্বিগুণ ফল প্রাপ্তি হবে।' (৩৪ : ৫ : ১)

দশম বিন্দু

কোরাণ এবং স্ত্রী জাতি

স্বয়ং অলৌকিক হওয়া সত্ত্বেও, লৌকিক উন্নতির এমন কোনো দিক নেই, যেদিকে ইসলামের দৃষ্টি দেখা যায় না। প্রাচীন জাতিগুলির ধর্মপ্রিয়তার কথা সুবিদিত। আজকালকার জাতিগুলি সম্বন্ধেও বলা হয়ে থাকে যে তাদের উন্নতির মূলেও তাদের ধর্মের প্রভাব। যদিও ধার্মিক বিচার অনুভূত রূপে ব্যক্তির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, কিন্তু বস্তুত সেই বিচারই বাহ্যিক ব্যবহারের মধ্যেও প্রতিফলিত হয়ে পড়ে। বাইরে থেকে দেখলে ধর্মের অঙ্গীভূত লুক্কায়িত অস্থিপঞ্জরকে তেমনভাবে চোখে পড়ে না, কিন্তু কে বলতে পারে সেটাই তার অস্তিত্বের প্রমাণ নয়? মানুষ ধীরে ধীরে সেই বিচার ধারায় এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়ে যে তাকে পরিত্যাগ করার চেয়ে আপনার সর্বস্ব পরিত্যাগ করা তার কাছে সহজ হয়। ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনার অনেক উদাহরণ আছে। আশাব্যঞ্জক ধর্ম মানুষকে স্বর্গের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায় এবং নৈরাশ্যব্যঞ্জক ধর্ম পাতালের দিকে। যেভাবে ধর্ম একান্তই ব্যক্তিগত বিষয়, ঠিক সেইভাবেই অনেক ব্যক্তির ধর্ম একত্রিত হয়ে সমষ্টিগততে পরিবর্তিত হয়। সে জন্যই তার প্রভাব ব্যক্তির আত্মা থেকে শুরু করে জাতির আত্মাতে প্রসারিত হয়।

সমাজ এবং নারী

কোরাণ শরীফ এমন এক ধর্মের প্রচার করে যার প্রভাব অনেক ব্যক্তির ওপরে অবশ্যই পড়ে। তার শিক্ষা অথবা ধর্মের প্রভাব, ব্যক্তি অথবা জাতির ওপরে কতটা পড়েছে তো এই নিবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। প্রত্যেক জাতির দুটি অঙ্গ, পুরুষ ও নারী। এই দুই রথচক্রের সাহায্যেই কোনো জাতি পৃথিবীতে উন্নতির পথে দ্রুত অগ্রসর হতে পারে। যেমন কোনো যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্রাংশের যথাবিহিত বিন্যাস তাকে সচল করে তোলে তেমনই সমাজ এই দুই অংশকে যথাবিহিত বিন্যস্ত করে সমাজকে সচল করে তোলে। কোরাণ শরীফের শিক্ষা একটি বিশেষ সময়কালকে ধরেই আরম্ভ হয়েছে। তাকে এক বিশেষ পরিস্থিতিতে স্পষ্ট হয়ে ঘনীভূত হতে হয়েছে অবশেষে বিস্তৃত ও প্রসারিত হয়েছে। অতঃপর এটা অন্যায় হবে, যদি আমরা সেই সময়ের অবস্থাকে না দেখে, এর বিচার আরম্ভ করি। কোরাণ শরীফে নারীজাতিকে যে স্থান প্রদান করা হয়েছে, তাকে সেই সময়ের পরিস্থিতিতে বিচার করতে হবে।

নারী জাতির প্রতি অত্যাচার করো না

কোরাণ শরীফের নিম্নে উদ্ধৃত বাক্যটি তৎকালীন নারী জাতির অবস্থা এবং তাদের প্রতি ইসলামের উপকারকেই প্রকট করে—

'হে বিশ্বাসীগণ! (মুসলমানেরা)! এটা ন্যায় নয় যে তুমি বলপূর্বক নারীদের প্রাপ্য দায়ভাগ দখল করো কিংবা যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের ব্যভিচার পরিষ্কার প্রমাণিত না হয় ততক্ষণ তোমরা তাদের যা দিয়েছ তা ফেরৎ নেবার জন্য তাদের অবরুদ্ধ করে রাখো। নারীদের সঙ্গে ন্যায় অনুমোদিত ব্যবহার করো। তারপরেও যদি তারা তোমার প্রিয় না হয়, তাহলে কি আর হতে পারে—এমন কোনো বস্তু তোমার কাছে প্রিয় মনে হচ্ছে না অথচ ঈশ্বর তার মধ্যে অনেক সৎগুণ দিয়ে রেখেছেন।' (৪ : ৩ : ৫)

তখনকার দিনে আরব দেশে রেওয়াজ ছিল, পুরুষেরা যখন স্ত্রীকে আর কাছে রাখতে চাইত না, তখন তার প্রতি কোনো দোষারোপ করে তার স্ত্রীধন থেকেও তাকে বঞ্চিত করে দেওয়া হতো। এই জঘন্য প্রথাকে রোখবার জন্য কোরাণ শরীফে বলা হয়েছে—

'যদি তুমি এক স্ত্রীর পরিবর্তে অন্য স্ত্রী আনতে চাও এবং প্রথমাকে যদি অনেক ধন সম্পদ ইতিপূর্বে দিয়ে থাকো, তাহলে তা থেকে কোনো কিছু ফেরত নিও না। সেরকম করে কি অপরাধ এবং অপযশ নিতে চাও।' (৪ : ৩ : ৫)

বিবাহযোগ্যা নারী

সত্যি সত্যি আরব নিবাসীরা তৎকালে তাদের অন্যান্য স্থাবর, জঙ্গম সম্পত্তির মতো নারীদেরও জঙ্গম সম্পত্তি বলে মনে করত। এর বিরোধিতা করে এবং সমাজে বিবাহ প্রথাকে সুব্যবস্থিত করার উদ্দেশ্যে কোরাণ শরীফে নিম্নোক্ত উপদেশ দেওয়া হয়েছে—

'তোমার পিতা যাকে বিবাহ করেছেন, তাকে তুমি বিবাহ করো না। আগে যা হয়েছে তা হয়েছে। নিশ্চই এটি লজ্জাজনক ও নিকৃষ্ট প্রথা।' (৪ : ৩ : ৮)

কার কার সঙ্গে বিবাহ অনুচিত সে সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

'তোমার মা, কন্যা, ভগ্নী, পিসি, মাসী ও ভ্রাতৃ কন্যারা, ভগ্নীকন্যা, স্তনদুগ্ধ পান করিয়েছে যে মাতা, দুধের সম্পর্কে যে ভগ্নী, শাশুড়ী, তোমার দ্বারা পালিত, তোমার স্ত্রীর ভিন্ন ঔরসে জন্মগ্রহণ করা কন্যা, পুত্রবধূ, দুই ভগ্নীকে একত্রে— ইত্যাদি তোমার বিবাহ নিষিদ্ধ।' (৪ : ৩ : ৯)

পরনির্ভরতা সমস্ত অন্যায়ের কারণ। পরনির্ভরতার চরমে পৌছে নারীরা স্বয়ং ব্যসনে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে তাদের মুক্ত করার জন্য বলা হয়েছে—

'ঈশ্বরকে সাক্ষী করো না, চুরি করো না, ব্যভিচার করো না। সন্তান হত্যা

করো না, মিথ্যাকে সত্য করো না।…ইত্যাদি বিষয়ে যারা শপথ নিতে আসবে, হে নবী! ঈশ্বরের কাছে তাদের জন্য তুমি ক্ষমা ভিক্ষা করো। নিঃসন্দেহ, প্রভু ক্ষমাশীল।' (৬০ : ২ : ৬)

বিবাহের সংখ্যা

যদিও কোরাণ বহু বিবাহকে প্রতিপাদিত করে, তথাপি তাকে চারটির সীমার মধ্যে বেঁধে রাখা হয়েছে, যা ছিল তখনকার দিনে অগুণতি পত্নী রাখার যে অধিকার আরব বাসীরা ভোগ করত তার ওপরে নিদারুণ আঘাত। কোরাণে বলা হয়েছে—

'তাহলে যথেচ্ছ বিবাহ করো, দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার, পুনবায় যদি আশংকা হয় যে প্রকৃত ন্যায়-বিচার করতে পারবে না, তাহলে মাত্র একটি।'

(৪ : ১ · ৩)

এখানে সেই সর্ত রাখা হয়েছে, যদি তুমি সবার প্রতি ন্যায় পূর্বক ব্যবহার করতে পারো তবে এক বা একাধিক বিবাহ করতে পারো। কিন্তু এ কথা তো স্পষ্ট, অনেক স্ত্রী বিবাহ করে তাদের প্রত্যেকের প্রতি ন্যায় ব্যবহার কত জন করতে পারে? একটা প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে যে বেড়ালের ভাগে শিকা ছেঁড়া। মতলবীরদল কোরাণের বাক্যের অপব্যাখ্যা করে বহুবিবাহ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু কোরাণ শরীফের উপদেশানুসারে তেমন হবার কোনো অবকাশ নেই। কোরাণ তৎকালীন সামাজিক পরিস্থিতি দেখে বিবাহকে চারটির মধ্যে সীমিত রাখতে বলেছে তাও কিছু সর্ত পালন করলে পরে। বিলাসপ্রিয় ধনিকেরা এই সমস্ত সর্ত উল্লঙ্ঘন করে বেড়ার আড়ালে শিকার খেলা আরম্ভ করে। অনেক নবাব বাদশা তাদের বিশাল হারেমের প্রশ্নে কোরাণের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলেছেন আজ্ঞা ওখান থেকে পেয়েছি।

এরকম স্বেচ্ছাচারিতা সমস্ত ধর্মের অনুগামীদের মধ্যেই দেখা যায়। গার্হস্থাশ্রম অথবা বিবাহ সম্বন্ধীয় সমস্ত বেদমন্ত্রেই পতি-পত্নীর জন্য দ্বিবচন দম্পতি, জম্পতি, জায়াপতি আদি শব্দ ব্যবহৃত হয়। কিন্তু তারা কি তাদের বেদ অনুসারে বহুপত্নী বিবাহ থেকে বিরত হয়েছে?

ইসলামে নারীদের বিষয়ে একটি কথা খানিকটা অস্বস্তিকর লাগে। সেটা হলো পর্দা প্রথার অবরোধে বন্দী। এই প্রথা প্রকৃত পক্ষে মেয়েদের একান্ত নির্বাসনে ঠেলে দেয়। এর ফলে তারা শিক্ষাদীক্ষা বিহীন কূপমণ্ডুকে পরিণত হয়। এই বিষয়ে বিচার করার পূর্বে আমাদের পর্দা বিষয়ক মূল বিষয়টিকে সামনে রাখা দরকার—

'হে নবী! আপন স্ত্রী, কন্যা এবং মুসলমান স্ত্রীদের বলো যে তারা যেন তাদের মর্যাদার চাদর খানিকটা ওপরে করে রাখে, এবং তা এজন্য, যাতে তাদের চেনা যায় এবং কেউ তাদের বিরক্ত করবে না।' (৩৩ : ৮ : ১)

'মুসলমান স্ত্রীদের বলে দাও তারা যেন দৃষ্টি আনত রাখে এবং তাদের গোপনীয় অঙ্গকে আচ্ছাদিত রাখে, যা স্বয়ং প্রকট হয় তাছাড়া অন্য কোনো সৌন্দর্যকে যেন না দেখায়। নিজের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, পূর্বতন পতির পুত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনেয়, আপন দাসী, সেবিকা, আশ্রিতা, যৌন কামনা রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক, যারা স্ত্রী ভেদ জানে না এই সকলের সামনে অতিরিক্ত ওড়নার সাহায্যে বুক ঢেকে নাও এবং তারা যেন তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশিত না করে। লঘু পদক্ষেপে চলো কারণ পদক্ষেপ দৃঢ় হলে তাদের পায়ের গোপন আভরণ প্রকাশিত হয়ে পড়বে।' (২৪ : ৪ : ৫)

পর্দা

প্রথম বাক্যে শরীরে চাদর জাতীয় কোনো বস্ত্র আচ্ছাদিত করার অভিপ্রায় মুসলমানেরা ভালো মতোই জেনেছে, সেই সঙ্গে তাদের (নারীদের) উত্যক্ত না করার কথাও বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যেও সৌন্দর্য প্রদর্শন রোখার নামে তাদের বস্তাবন্দী করার অভিপ্রায়কে অন্যায় বলা হয়েছে। এর সুস্পষ্ট অর্থ এই যে, পাশ্চাত্য সমাজের নারীদের মধ্যে যেমন সৌন্দর্য প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা লেগে গেছে, এবং যার ফলে তারা শীতের ঋতুতেও অর্ধেক বক্ষস্থল উন্মুক্ত রাখে। সেরকম ভাব যেন ইসলামী সমাজের নারীদের মধ্যে প্রবেশ না করে। বস্তুত এ ধরনের মানসিকতা নারী পুরুষ উভয়ের মধ্যেই আসা ঠিক নয়। প্রবাদ আছে যে, শয়তানও তার মতলব হাসিল করার জন্য শাস্ত্রের দোহাই পাড়ে, ঠিক সেই-ভাবেই মুসলমান পুরুষদের এটা ঘোরতর অন্যায় যে কোরাণ শরীফে বর্ণিত পর্দায় সন্তুষ্ট না হয়ে, তারা মেয়েদের পুরু পর্দার আড়ালে বন্ধ করে রেখেছে। কোরাণ শরীফ তো শৃঙ্গার আদি রসভাবের যাতে প্রকাশ না হয় সেজন্য কয়েকটি বিশেষ নারী অঙ্গকে ঢাকার কথা বলেছে, কিন্তু সেই সুযোগে পুরুষেরা মেয়েদের সমস্ত শরীরে বোরখা চাপিয়েও সন্তুষ্ট হয় না, তাদের অন্তঃপুরে বন্ধ করে রাখাটাকেই উচিত মনে করে। তবে এই মনোভাব শুধু মাত্র মুসলমান পুরুষদের মধ্যেই দেখা যায় না, যেমন প্রবাদ আছে যে 'গুরু তো তেমনই রইল কিন্তু চ্যালা চীনা হয়ে গেলো', ঠিক তেমনভাবে এই কুপ্রথা এখন হিন্দু পরিবারের মধ্যেও অনুপ্রবেশ করছে। হিন্দু পুরুষেরা অতীতে কখনো পর্দা প্রথার নাম শুনেছিল? আজও মহারাষ্ট্র, গুজরাত, কর্নাটক, অন্ধ্র, দ্রাবিড়, মালাবার ইত্যাদি অঞ্চল যা প্রায় অর্ধেক ভারতবর্ষের সমান, সেখানকার হিন্দুরা পর্দা প্রথা জানে না। কিন্তু যেভাবে ইংরেজ শাসিত রাজ্য অনেকেই ইংরেজদের খাদ্য পানীয়, পোশাক পরিচ্ছদ,

আচার-ব্যবহারকে গৌরবজনক মনে করে তাদের অনুকরণ করে সে রকমভাবেই কিছু হিন্দুরা গৌরব মনে করে, আর কিছু তাদের রমণীদের রক্ষার কথা ভেবে, মুসলমানদের এই প্রথাকে গ্রহণ করে তাকে কঠোরতার দিক থেকে আরও উন্নত করেছে।

প্রথম দিকে এই প্রথা ধনী এবং সম্ভ্রান্ত বলে পরিচিত হতে ইচ্ছুক লোকেরা গ্রহণ করে, অতঃপর প্রায় সকলেই সম্ভ্রান্ত হওয়ার প্রেরণায় নারী জাতির ওপরে এই দণ্ড বিধান করা শুরু করে। শরীরে কোমলতা বৃদ্ধির জন্য, রাণীদের অসূর্যম্পশ্যা হতে দেখা গেছে, কিন্তু অচন্দ্রম্পশ্যা হবার সৌভাগ্য আজকের অবরোধের নারীরা লাভ করেছে।

'ইহৈবাস্ত মা বিয়ৌষ্টম্' (দুজনে এখানেই থাকো, পৃথক হয়ো না) বিবাহ-সম্বন্ধী এই বেদমন্ত্রের মধ্যে বিবাহিত দম্পতিকে পৃথক হতে নিষেধ করা হয়েছে। এই নিয়মে আর্যরা (হিন্দু) বিবাহ সম্বন্ধকে অখণ্ডনীয় মনে করে, সেখানে কোনো কোনো ধর্ম বিশেষ পরিস্থিতিতে বিবাহ-বিচ্ছেদ অথবা তালাকের অনুমতি দেয়। কোরাণ শরীফ বলে—

'যারা নিজেদের পত্নী থেকে পৃথক হওয়ার অর্থাৎ তালাক গ্রহণের শপথ করেছে, তারা চার মাস কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, এর মধ্যে যদি মিল হয়ে যায়। তবে ঈশ্বর ক্ষমাশীল এবং কৃপালু। যদি তালাক নিশ্চিত হয়ে থাকে, তবে ঈশ্বর তা শোনেন এবং জানেন। তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীরা তিন ঋতুকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। যা কিছু ঈশ্বর তাদের উদরে সৃষ্টি করেছেন তাকে গোপন করা তাদের জন্য বৈধ নয় তাদের পতিদেরও অধিকার আছে ইতিমধ্যে তাদের ফিরিয়ে নেবার, যদি তারা সংশোধিত হয়ে গিয়ে থাকে। স্ত্রীদের ন্যায়ানুসারে অধিকার আছে কিন্তু পুরুষের স্থান তাদের ওপরে।' (২ : ২৮ : ৫-৭)

যদিও এখানে কিছু সর্ত সহকারে তালাকের অনুমতি দেওয়া হয়েছে, তাহলেও একে আদর্শ বলে স্বীকার করা হয়নি। একথা মুহম্মদের এই বচন থেকে প্রকট হয়—

হলালা এবং মুতআ

'মানুষের জন্য সমস্ত বিধানের মধ্যে তালাক ঈশ্বরের অত্যন্ত অপ্রিয়।'

তালাক ঘোষিত হওয়ার পরও ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মেলবন্ধন ঘটানোর অবসর দেয়। ইসলামী রীতিতে এই রীতিকে হলালা বলে। কোরাণ শরীফে বলা হয়েছে—

'যদি তাকে তালাক দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তাহলে সেই পুরুষের কাছে সেই স্ত্রী আর 'হলালা' (বৈধ) নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো পুরুষ সেই স্ত্রীকে বিবাহ করে এবং তালাক না দেয় ততক্ষণ পর্যন্ত বৈধ হয় না। দ্বিতীয়-

বার তালাক হবার পর সেই পূর্বতন পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ে যদি মনে করে, তারা ঈশ্বরের সীমারেখার মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তাহলে আবার তাদের পতি-পত্নী সম্বন্ধে ফিরে যেতে কোনো বাধা নেই।' (২ : ২৯ : ২)

সাধারণ বিবাহ সম্বন্ধের অতিরিক্ত 'শিয়া' সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানেরা আরেক ধরনের স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধকে স্বীকার করে যার পারিভাষিক নাম 'মুতঅ'। এই সম্বন্ধ চিরকালীন নয়, কিছু বিশেষ সময়ের জন্য হয় তারপর সেই সম্বন্ধ নিজেই ভগ্ন হয়ে যায়।

স্ত্রী-পুরুষ সম্বন্ধে কোরাণে উপমা দিয়ে বলেছে—

'স্ত্রীরা তোমাদের আবরণ এবং তোমরা তাদের।' (২ : ২৩ : ৫)

'স্ত্রীরা তোমাদেরই।' (২ : ২৭ : ২)

স্ত্রী-পুরুষের এবং পুরুষ-স্ত্রীদের নিজস্ব দোষকে ঢাকতে পারে। সেজন্যই এখানে একজনকে আরেকজনের বস্ত্র বলা হয়েছে। দ্বিতীয় বাক্যে শুধু মাত্র সন্তান উৎপাদনের জন্যই স্ত্রী-পুরুষের কৃষি ও কৃষক হওয়া অনুচিত বলে, বলা হয়েছে। যেমন কৃষির ওপরে কৃষকের জীবন নির্ভরশীল, তেমনই স্ত্রীর ওপরে .পুরুষ জগতের অস্তিত্ব নির্ভরশীল হওয়াও ধ্বনিত হয়েছে।

'পুরুষ স্ত্রীর ওপরে অধিষ্ঠিত, কারণ ঈশ্বর কাউকে কারো থেকে বড় করেছেন।' (৪ : ৬ : ১)

উপরোক্ত বাক্য অবশ্যই মেয়েদের পক্ষে বিশেষ নৈরাশ্যজনক। এই বাক্যে স্ত্রীর ওপরে পুরুষের আধিপত্য স্বীকার করা হয়েছে, তবে এই অবস্থার পিছনেও ছিল তৎকালীন পরিস্থিতি। তবে একথাও সত্য যে ইসলাম তাদের অন্যান্য যে সমস্ত অধিকার দিয়েছে তার ফলে নারী জগৎ কম উপকৃত হয়নি। তখনকার পরিস্থিতিতে যতটা করা সম্ভব ছিল করা হয়েছে। এখন নারীর ওপরে পুরুষের একচ্ছত্র অধিকার কতটা কিভাবে থাকবে তার নির্ণয় করা মুসলমান মেয়েদের কাজ।

যদিও ধর্মের নামে মুসলমান স্বামীরা তাদের গৃহলক্ষ্মীদের প্রতি অনেক অত্যাচার করেছে এবং এখনো সে রকম চলছে কিন্তু এই বিন্দু পাঠ করার পর এ বিষয় জ্ঞাত হবে যে সে সমস্তর জন্য কোরাণ অথবা ইসলাম দোষী নয়। ইতিহাস সাক্ষী যে মহাত্মা মুহম্মদের সবচেয়ে কম বয়সের এবং অত্যন্ত সুন্দরী স্ত্রী শ্রীমতী আয়েষা এবং তাঁর সপত্নী শ্রীমতী উম্ম-সল্‌মা উহদের যুদ্ধে আহতদের নিজের হাতে শুশ্রূষা করেছেন, জল পান করিয়েছেন। শ্রীমতী সফিয়া, মহাত্মার আরেক স্ত্রী, পুরুষদের অনুপস্থিতিতে অবশিষ্টদের জড়ো করে স্বয়ং যুদ্ধ ক্ষেত্রে সৈনিকের ভূমিকা পালন করেছেন, যদি তখনকার স্ত্রীরা বর্তমান কালের মুসলমান স্ত্রীদের মতো হতো, তাহলে কিভাবে তাদের দ্বারা উপরোক্ত কাজ করা সম্ভব হতো। মিশর, তুরস্ক ইত্যাদি মুসলমানী দেশের নারী সমাজ এখন জেগে উঠেছে।

সাম্প্রতিক কালে আঙ্কারা (তুরস্ক) থেকে সংবাদ এসেছে যে সেখানকার শিক্ষামন্ত্রী হয়েছেন একজন মহিলা। তাছাড়া ইদানীং কালে মিশরের হাজার হাজার নারী পর্দা সরিয়ে তাদের রাজনৈতিক দাবী সমূহের স্বীকৃতির উৎসব পালন করেছে। এ সমস্ত তথ্য এই বিষয়ের পক্ষে পর্যাপ্ত প্রমাণ যে মুসলমানী সমাজেও নারী জাতির ভবিষ্যৎ অত্যন্ত উজ্জ্বল।

একাদশ বিন্দু

অলৌকিক শক্তি

আপন আপন ধর্মের মহাত্মাদের অলৌকিক শক্তির প্রমাণ হিসাবে অনেক চমৎকার কিংবা মোঅজিজার (miracle) কাহিনী সমস্ত ধর্মের মধ্যেই বহুল প্রচলিত। কোরাণ শরীফেও অনেক এ ধরনের অলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে। তার মধ্যে অনেকগুলি ইহুদী ও খৃস্টিয়দের ধর্মগ্রন্থেও বর্ণিত আছে। কিছু বিশেষ চমৎকারিত্ব স্বয়ং মহাত্মা মুহম্মদের জীবনেও দেখা গেছে। আরবের লোকেরা এ ধরনের চমৎকারে বিশেষ বিশ্বাসী ছিল। তারা হজরত মুহম্মদকেও বারম্বার সেই ধরনের চমৎকার দেখাবার অনুরোধ করত। তারা বলত—

যদি তুমি ভগবদ্দূত (রসুল) হয়ে থাকো, তবে কেন তোমার সঙ্গে দেবদূত থাকে না ? কেন নিজের জন্য মেওয়ার উদ্যান সৃষ্টি করে নাও না ? কেন কাগজে লিখিত কোরাণ তোমার কাছে আসেনি। এর উত্তরে কোরাণ শরীফে বলা হয়েছে—

'যদি আমি (ঈশ্বর) তোমার (মুহম্মদ) ওপরে কাগজে লেখা কোরাণ অবতীর্ণ করতাম তাহলেও তারা হাতে ছুঁয়ে বলবে—এ সমস্তই যাদু ভিন্ন আর কিছু নয়।' (৬ : ১ : ৭)

মূসা ও ঈসার অলৌকিক শক্তি

তৌরাতে বর্ণিত মহাত্মা মূসার চমৎকার—'সমুদ্র ভেদ করে পথ নির্মাণ করা' (২ : ৬ : ৪)। 'পাথরের ওপর তার হাতের লাঠি ঠোকার সঙ্গে সঙ্গেই সেখান থেকে বারোটি স্রোত নির্গত হতো' (৭ : ২০ : ৬)। হাতে চকচকে মোহর (২৬ : ২ : ২৪), চমৎকারী লাঠি, যে মাটিতে রাখা মাত্রই সাপ হয়ে যেত (২৬ : ২ : ২৩)। মেরে একশো বছর পর্যন্ত রেখে তারপর জীবিত করা (২ : ৩৫ : ২)। মহাত্মা ঈসার চমৎকারের বিষয়ে বলা হয়েছে—

'যখন ঈশ্বর বললেন, হে মরিয়ম-পুত্র ঈসা ! তোমার প্রতি, তোমার মাতার প্রতি আমার উপকার স্মরণ করো, যখন তোমাকে পবিত্র আত্মার দ্বারা সহায়তা দিয়েছিলাম, তুমি মাতৃক্রোড় থেকে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে মানুষের সঙ্গে কথা বলতে। আমি তোমাকে যুক্তি, ঐশীগ্রন্থ তৌরাত ও ইঞ্জীল শিক্ষা দিয়েছি। যখন তুমি মাটি দিয়ে পাখী বানাতে এবং তাতে ফুঁ দিতে তখন তা আমার আজ্ঞাতেই সজীব হয়ে উড়ে যেত। তুমি আমার আদেশেই অন্ধকে, কুষ্ঠরোগীকে সুস্থ করে তুলেছ। আমার আদেশেই মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করেছ। যখন

তুমি প্রমাণসহ এসেছিলে তখন আমি ইস্রাইল বংশীয়দের তোমার প্রতি সংযত রেখেছিলাম। কিন্তু তাদের মধ্য থেকে নাস্তিকের দল বলতে থাকে এ তো পুরোপুরি ইন্দ্রজাল।' (৫ : ১৫ : ২)

মহাত্মা মুহম্মদের অলৌকিক শক্তি

মহাত্মা মুহম্মদ যদিও অলৌকিকত্ব দেখাতে অধিকাংশ সময়ে অসম্মত হতেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও কোরাণের কিছু বাক্য তাঁর কিছু চমৎকারকে প্রকট করে। নীচে তা সংক্ষেপে দেওয়া হলো—

(১) 'যখন নিক্ষেপ করলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করনি, কিন্তু ঈশ্বর নিক্ষেপ করেছেন।' (২ : ২ : ৬)

বদর যুদ্ধের সময় হজরত একমুঠো মাটি শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করেছিলেন, অতঃপর শত্রুরা পরাজিত হয়। এটা তারই সংকেত।

(২) 'প্রভু তাঁর নবী এবং মুসলমানদের কাছে শান্তি এবং সেনা পাঠিয়েছিলেন, যাকে তোমরা দেখতে পাওনি।' (৯ : ৪ : ১)

এখানে একটি যুদ্ধে ঈশ্বর ফেরেস্তাদের একটি বাহিনী পাঠিয়ে মহাত্মার সহাযতা করেছিলেন—সেদিকে সংকেত করা হয়েছে।

(৩) 'তিনি (ঈশ্বর) পরম পবিত্র, যিনি তার সেবককে (মুহম্মদকে) রাত্রিকালে পবিত্র মসজিদ (কাবা) থেকে অন্তিম মসজিদে (স্বর্গে), যার চতুর্দিক পবিত্র এবং ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ—নিয়ে গেছেন, এবং তাঁকে তাঁর প্রমাণ দেখাবেন।' (১৭ : ১ : ১)

'তাঁকে তাঁর দ্বিতীয় অবতরণের সময় প্রান্তবর্তী বদরিকা বৃক্ষের নিকটে, বাসোদ্যান (স্বর্গ) দর্শন করানো হয়েছিল।...নিঃসন্দেহ, তিনি (মুহম্মদ) তাঁর প্রভুর সর্বাপেক্ষা বড় প্রমাণ দেখেছিলেন।' (৫৩ : ১ : ১৩-১৫, ১৮)

এখানে মহাত্মা মুহম্মদের সজীব স্বর্গ যাত্রার বর্ণনা করা হয়েছে যাকে বলা হয় 'মিঅরাজ।' ঈশ্বর তাঁকে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে আপন ঐশ্বর্য দেখিয়েছিলেন।

(৪) 'যখন আমি জিনদের (এক প্রকারের দেবতা) মধ্যে অনেককে তোমার প্রতি আকৃষ্ট করি, তাদের মধ্যে যারা কোরাণ শুনেছিল এবং তোমার কাছে এসেছিল তারা পরস্পরকে বলেছিল চুপ করে শোনো। অতঃপর কোরাণ আবৃত্তি সমাপ্ত হলে, তারা সতর্ককারীরূপে আপন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গেলো।' (৪৬ : ৪ : ৩)

জিন অগ্নি থেকে উৎপন্ন এক জীব। এখানে এ কথাই বলা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই মহাত্মা মুহম্মদের কাছে কোরাণ শরীফ শুনে মুসলমান হয়ে যায় এবং তারা তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ফিরে গিয়ে তার প্রচার আরম্ভ করে।

(৫) 'সেই মুহূর্ত সমীপবর্তী হলো যখন চন্দ্রমা খণ্ডিত হয়ে গেলো।'
(৫৪ : ১ : ১)

এটি মহাত্মা মুহম্মদের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ 'শককুলকমু' নামের চমৎকারের বর্ণন। মহাত্মা তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখানোর জন্য একবার আঙুল চন্দ্রের দিকে নির্দেশ করেছিলেন তারপর তা দুটুকরো হয়ে যায়; যে দৃশ্য অনেক অনুগামীরাই স্বচক্ষে দেখেছিল।

কোরাণ শরীফে একেশ্বরে বিশ্বাসের ওপরে অত্যধিক জোর দেওয়া হয়েছে। একবার দুবার নয় অন্তত শতাধিকবার বলা হয়েছে যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, তিনি ব্যতীত আর কেউ আরাধ্য নেই। এখানে ঈশ্বরকে সর্বব্যাপক এবং সর্বজ্ঞ মানা হয়েছে। মহাত্মা ঈসার (যীশু) আলোচনা কালে আমরা দেখেছি যে অবতারবাদকে অত্যন্ত জোরের সঙ্গে খণ্ডন করা হয়েছে। কোরাণ শরীফে খোলাখুলি একথা বলা হয়েছে যে ঈশ্বর তোমাদের পূর্বজদের প্রদর্শিত পথেই তোমাদের চালাতে চান। (৪ : ৪ : ১)

মহাত্মা মুহম্মদ কোনো নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠার দাবি করেননি, তিনি সেই 'দীন-ইব্রাহীম' অথবা ইব্রাহীম এর পন্থের পুনঃপ্রচার করেছেন, যা মহাত্মা মুহম্মদের জন্মের সহস্র বৎসর আগে বিদ্যমান ছিল।

মহাত্মা মুহম্মদ সেই বিশেষ ব্যক্তিদের অন্যতম যাদের স্থান অন্যান্য সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক উঁচুতে। প্রকৃতি যেমন কোথাও কোথাও গভীর খাদের কাছেই উত্তুঙ্গ গিরিশিখর সৃষ্টি করে। ঠিক তেমন ভাবেই এই সব মহান্ আত্মারা তাদের জন্মভূমিতে মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করেন। যদিও 'মোমিন' এবং 'মুস্লিম' শব্দ দুটির অর্থ 'সত্যপ্রিয়' এবং শান্তিপ্রিয়, তা সত্ত্বেও বহু জায়গায় এ দুটির অর্থকে অনেক সংকুচিত করে গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই ভ্রান্তির কারণেই পৃথিবীতে ইসলামের নামে অনেক অনুচিত কাজ করা হয়েছে। পণ্ডিতেরা একথা স্বীকার করেছেন যে, নিতান্ত বাধ্য হয়ে একান্তভাবেই আত্মরক্ষার জন্য তিনি (মুহম্মদ) অস্ত্রধারণ করেছিলেন কিন্তু পরবর্তীকালে বহু লোকই এই ঘটনার বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। তারা বলতে চেয়েছেন যে মহাত্মা মুহম্মদ যুদ্ধের মাধ্যমে ধর্মের প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। বাস্তবে মহাত্মা মুহম্মদ ছিলেন অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির এবং একান্ত প্রয়োজন না হলে রক্তপাতের ঘোরতর বিরোধী।

'অল্লাহু লা-মহিব্বুল্ ফসাদ্।' (২ : ২৫ : ৯)
(ঈশ্বর কলহ পছন্দ করেন না।)

উপরোক্ত বাক্যটিও সেই মনোভাবেরই প্রতিফলন।

'লকুম দীন-কুম্ বলী দীনি'।

('তোমার জন্য তোমার ধর্ম আমার জন্য আমার ধর্ম')—এই বাক্যটিও ধর্মীয় সহিষ্ণুতার শিক্ষা দেয়। ইসলামকে বোঝার জন্য আমাদের উপরোক্ত কোরাণ

বাক্যের ওপরে বিচার করতে হবে। কতিপয় মুসলমানের আচরণ দেখে সমগ্র ইসলাম সম্পর্কে রায় দিয়ে দেওয়া সঠিক নয়।

মহাত্মা মুহম্মদ ছিলেন একজন শান্তিপ্রিয় এবং ঈশ্বরভক্ত। আরও বহু সদ্‌গুণ তার মধ্যে ছিল। যেহেতু তিনি ছিলেন মানুষ অতএব তিনি সর্বদোষমুক্ত ছিলেন এমন কথা হয়তো বলা যায় না কিন্তু তিনি মনুষ্যজাতির পরম উপকার করেছেন। অগণিত মানুষ তাঁর উপদেশে শান্তিলাভ করেছে। এই স্বল্প পরিসরে কোরাণ শরীফের সারমর্ম গ্রহণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। যথার্থ ইসলাম ধর্মও তাই যাকে কোরাণ শরীফ তার নিজস্ব শব্দে প্রতিপাদিত করেছে।

★